'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের চিরন্তন আলোচকগণ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে কাব্যালোচনার সূত্রপাত করেন। অর্থাৎ কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা শব্দ ও অর্থের আলোচনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত আলংকারিক ভামহ বলেছিলেন, 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'। এর বাংলা অর্থ হল শব্দ ও অর্থের সহযোগে কাব্য সৃষ্টি হয়। শব্দ ও অর্থের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক বিচারের আগে 'শব্দ' বলতে আমরা কি বুঝি সেই আলোচনা জরুরী। ব্যাকরণগত দিক থেকে 'শব্দ' বলতে আমরা বুঝি কতগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি। অর্থাৎ যখন কতগুলি ধ্বনি পাশাপাশি বসে অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা শব্দ বলি। শব্দের সঙ্গে অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি কখনই অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে শব্দ ও অর্থকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। যাই হোক না কেন, কাব্যালোচনায় শব্দের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশি তা বলা বাহুল্যমাত্র।

শব্দ হল কাব্যের মাধ্যম। আমরা সবাই জানি যে শিল্পের জগৎ বহুধা বিভক্ত। কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—এসবই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি আলাদাভাবে শিল্প-তাৎপর্য লাভ করলেও এগুলির মাধ্যম কিন্তু এক নয়। চিত্রকর রঙ তুলির সাহায্যে মনের ভাব ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে কিংবা মৃৎশিল্পী মাটির ওপর নানা বিভঙ্গ রচনা করে মূর্তি গড়েন; আবার যাঁরা কবি বা সাহিত্যিক তাঁরা শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন। তাই কবি বা সাহিত্যিকদের অনেকেই বাক্‌শিল্পী বলে অভিহিত করেন। কাব্যের মাধ্যম যেহেতু শব্দ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, তাই সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যালোচনায় শব্দকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই শব্দ আসলে কি? এক কথায় বলা যায় শব্দ হল কাব্যশরীর। কাব্যের সঙ্গে মানুষের তুলনাটা খুব জুৎসই হয়। একটি মানুষ সম্পূর্ণতা পায় কেবল দেহে নয়, আত্মাতেও। সপ্রাণ মানুষই হল যথার্থ মানুষ। তার মধ্যেই আমরা আত্মাকে খুঁজি। যে মানুষের কেবল শরীর আছে, কিন্তু প্রাণ নেই, তাকে আমরা সম্পূর্ণ মানুষ বলতে পারি না। তাই মৃত মানুষের সঙ্গে অচেতন বস্তুরই নিকট সম্বন্ধ। কাব্যালোচনায় যাঁরা শব্দ ও অর্থকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন তারা কাব্যের আত্মাটিকে অস্বীকার করেছেন। তবু 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' বলতে সঠিক অর্থে কি বোঝানো হয়েছে তার আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্পর্ক রচিত হলেই যদি কাব্য হত তবে যে কোনো বিবৃতির মধ্যেই কাব্যত্ব অন্বেষণ করা যেতো। যেমন যদি বলা হয়, 'রাম স্কুলে যায়' কিংবা 'গাছে গাছে ফুল ফুটেছে', তবে এই দুটি বিবৃতি বা বাক্যের মধ্যেও কাব্যত্ব অন্বেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিবৃতি দুটির মধ্যে কাব্য নেই বলেই আমরা তার মধ্যে কাব্যান্বেষণের বৃথা চেষ্টা করব না। অথচ শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন বলেন, "কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে / তারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে" তখন বিবৃতিটি কাব্য হয়ে ওঠে। শব্দ ও অর্থই যদি

Scanned by CamScanner

কাব্য-রচনার একমাত্র শর্ত হত তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতির মত প্রথম বিবৃতি দুটিও রাখা হত। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'কে নিশ্চয় ভামহ অন্য অর্থে ব্যবহার করেছিলেন।

শব্দ ও অর্থের মিলিত সম্পর্কটি বোঝাতে ভামহই প্রথম 'সহিত' শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও এই 'সহিত' শব্দটির মধ্যে আরও গূঢ়ার্থ লুকিয়ে আছে। ভামহ 'সহিত' শব্দটি দ্বারা শব্দের ব্যাকরণগত শুদ্ধি ও ঔচিত্যের কথা বলতে চেয়েছেন। ভামহ 'সহিত' শব্দে যা-ই বোঝাতে চান না কেন, তাঁর সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

আচার্য কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থ বলতে কি বোঝায় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে শব্দচ্ছটার মধ্য দিয়ে যাঁরা কাব্যের মাধুর্য সৃষ্টি করতে চান তাঁরা যেমন কাব্যের সম্পদ প্রকাশে অসমর্থ হন তেমনি যাঁরা অর্থচাতুর্য দ্বারা কাব্যত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন তাঁরাও কাব্যসম্পদ প্রকাশে অক্ষম হন। শুধুমাত্র শব্দের আড়ম্বরে কিংবা নিছক অর্থের দ্বারা কখনই কাব্যত্ব হয় না, কাব্যত্বের জন্য সর্বদাই জরুরি শব্দ ও অর্থের মিলিত সত্তার চমৎকারিত্ব। যেখানে এই মিলনের অভাব থাকে সেখানে কাব্যের কাব্যত্বও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কুন্তক লিখেছেন :

"শব্দো বিবক্ষিতার্থৈকবাচকোঽন্যেষু সৎস্বপি
অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি-স্বস্পন্দ সুন্দরঃ"

এর অর্থ হল, অন্য কয়েকটি বাচক থাকলেও যা বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের বাচক হয়, তাকে বলে শব্দ; আর সহৃদয় ব্যক্তির মনে আনন্দ সৃষ্টি করে স্বভাবে যা সুন্দর হয়ে ওঠে তাকে বলে অর্থ। কুন্তকের বক্তব্য থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দরাজির সঙ্গে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতা যেহেতু ব্যঞ্জনামুখ্য শিল্প তাই সেখানে ব্যবহৃত শব্দগুলি নিছক আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমিত থাকে না। কাব্য রচনার পিছনে কবির বিশেষ এক অভিপ্রায় কাজ করে। এই অভিপ্রায়টি সফল হয়, যদি তিনি তাঁর অভিপ্রেত অর্থটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং অভিপ্রেত অর্থের উপযোগী শব্দ দিয়েই কবিকে কাব্যরচনা করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি তার সঙ্গে আভিধানিক অর্থের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও আনন্দের কোনো যোগ নেই। কিন্তু কবি কাব্যরচনাকালে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন এবং সেই শব্দগুলি যে অর্থকে পরিস্ফুট করে তার সঙ্গে আনন্দের নিবিড় যোগ আছে। এর কারণ হল প্রতিভাবান কবিরা বস্তুর বহিরঙ্গরূপটিকে গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাকেন না। বস্তুর বহিরঙ্গ রূপটিকে তিনি অন্তর্জগতে ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করে তার ভাবময় রূপদান করেন। সুতরাং ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েই কবিকে কাব্যোপযোগী শব্দান্বেষণ করতে হয়। ভাবের দ্বারাই কবির অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয় বলে শব্দের অর্থও হয়ে ওঠে আহ্লাদজনক এবং তা যে কোনো সহৃদয় পাঠকের মনে আনন্দ সৃষ্টির কারণ হয়। শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধটি বুঝতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে শব্দ যেমন অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, তেমনি অর্থও শব্দকে অবলম্বন করে। কুন্তক শব্দ ও অর্থের যে সহিতত্বের কথা বলেছেন তাতে শব্দ বলতে অভিপ্রেত অর্থ সংবলিত শব্দ এবং অর্থ বলতে সহৃদয়ের মনে আনন্দদানকারী অর্থকে বোঝানো হয়েছে,

Scanned by CamScanner

যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের সেই ক্ষমতা নেই, তাই শব্দ ও অর্থ মিলিত হলেই কাব্য হয় না।

'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থের অন্যত্রও কুন্তকের বক্তব্যের সমর্থন মেলে। সেখানে তিনি লিখেছেন :

"শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি"

অর্থাৎ 'সহিত বা মিলিত শব্দার্থ কাব্যজ্ঞদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলে কাব্য হয়।' বিষয়টি স্পষ্ট করতে তিনি পরে আরও বলেছেন—সাহিত্য হচ্ছে 'শব্দার্থের পরস্পর সাম্যসুভগ অবস্থান।' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সমতা ও সৌন্দর্য রক্ষিত হলে কাব্য সৃষ্টি হয়। কুন্তকের মতে, সাহিত্য হচ্ছে শব্দার্থের এমন এক শোভাশালী বিন্যাসভঙ্গি যা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারী হয়।' এর থেকে বোঝা যায় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের মধ্যে অল্পতা কিংবা বাহুল্য, কোনোটাই থাকা উচিৎ নয়। কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের সম্পর্কটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে অনেক অস্পষ্টতা দূর হয়েছে। ভামহের শব্দার্থ বিষয়ক আলোচনা কিন্তু কুন্তকের মত বিস্তৃত ও স্পষ্ট নয়।

আচার্য দণ্ডীও শব্দার্থের সম্পর্কটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, 'অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদাবলীই হল কাব্য।' এর অর্থ হল কবির কাব্যের মধ্যে একটি অভীষ্ট বা ঈপ্সিত অর্থ থাকবে। অভীষ্ট বা ঈপ্সিত অর্থের কথা বললেই কবি-প্রতিভা বা কবিমনের সঙ্গে তার যোগসূত্র রচিত হয়ে যায়। এই ঈপ্সিত অর্থ সৃজন করা যার তার কর্ম নয়। তাই তো জীবনানন্দ বলেছিলেন—'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি'। কবির সৃষ্ট ঈপ্সিত অর্থময় বাক্যের সঙ্গে সাধারণ বাক্যের তফাৎ অনেকটাই। সাধারণ বাক্যের সঙ্গে কবিমনের কোনো যোগ নেই। তাই তা আহ্লাদজনকও নয়। যেমন আমরা প্রথমে যে বিবৃতি দুটি হাজির করেছি তার সঙ্গে কবিমনের কোনো সম্পর্কই নেই। 'রাম স্কুলে যায়' কিংবা 'গাছে গাছে ফুল ফুটেছে'র মত বাক্য যে কেউ রচনা করতে পারে। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পংক্তি দুটির মধ্যে ব্যথাতুর মনের যে আর্তি ঝরে পড়েছে সেই আর্তিকে প্রকাশ করা কবিপ্রতিভা ছাড়া অসম্ভব। তাই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলতে পারি যে শব্দ ও অর্থের নিছক সম্পর্ক স্থাপনার মধ্যে দিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না, শব্দকে আশ্রয় করে কবি যখন অভীষ্ট অর্থকে ছুঁতে পারেন তখনই তা যথার্থ কাব্যত্ব লাভ করে।

Scanned by CamScanner

"কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ"

কাব্যালোচনায় অলংকারের গুরুত্ব খুব বেশি। এই গুরুত্বের প্রসঙ্গ বিচার করে একদা সংস্কৃত কাব্যবিচার শাস্ত্রকে অলংকারশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে সংস্কৃত আলংকারিকগণ যে কয়টি বিষয় গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছিলেন 'অলংকার' সেগুলির অন্যতম। অলংকারের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কি—সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমাদের জানা দরকার অলংকার কাকে বলে। সাধারণভাবে অলংকার বলতে আমরা 'গহনা'কে বুঝি। এই গহনা দিয়ে মানুষ নিজেকে সজ্জিত করে। সে নিজেকে আংটি, চুড়ি, হার, দুল, মণিবন্ধ ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে ভালোবাসে। অলংকার যে কেবল সোনা, রূপা কিংবা হীরে দিয়ে তৈরি হবে, এর কোনো অর্থ নেই। প্রাচীনকালে ফুলকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করার রীতি ছিল। বর্তমানে বিবাহ কিংবা অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানেও ফুলের অলংকার ব্যবহৃত হয়। অলংকার যা দিয়েই নির্মিত হোক না কেন তার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সজ্জিত করা। আমরা আগেই বলেছি যে মানব-শরীরের সঙ্গে কাব্য-শরীরের একটা সংগতি আছে। তাই মাঝে-মাঝেই আমরা উভয়ের মধ্যে তুলনার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই। মা যেমন সন্তানকে সাজিয়ে তৃপ্তি পান, কবিও তেমনি অলংকারের মোড়কে কাব্যকে সুন্দর করে তৃপ্ত হতে চান। আসলে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র যে কখনই মানুষ পরিতৃপ্ত হয় না। মানুষ এক বিশেষ শ্রী ও সৌন্দর্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সৌন্দর্য কারো ক্ষেত্রে বেশি, আবার কারো ক্ষেত্রে কম। কোনো মানুষই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে তৃপ্ত নয়। তাই মানুষ চায় অলংকারের ছোঁয়ায় সৌন্দর্যের মধ্যে Perfection আনতে। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের মনে যে চিরন্তন অভাববোধগুলো আছে, অলংকার সেগুলিকে অনেকাংশে ঢেকে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাই অলংকারকে 'চরমের প্রতিরূপ' বলেছিলেন। মানুষের মত কবিরও কাজ কাব্যজগতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে পাঠককে আনন্দ দেওয়া; তাই তিনি কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে অলংকারের ব্যবহার করে থাকেন।

মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতে, "বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়, অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য। কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।" আসলে মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত বামনের শেষোক্ত মন্তব্যটিকেই বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। কাব্যদর্শনে যারা দেহাত্মবাদী ছিলেন তাদের কাছে অলংকারের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। অলংকার বলতে সংস্কৃত আলংকারিকেরা শব্দ ও অর্থ উভয় অলংকারকেই বুঝিয়েছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতে অধিকাংশ কাব্য পাঠক কাব্যবিচারে দেহাত্মবাদী। তাই তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলংকারের আস্বাদন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হ'ল কাব্যের ক্ষেত্রে অলংকারের প্রয়োজন কতখানি। অলংকার ছাড়া কি সার্থক কাব্য রচিত হওয়া সম্ভব?

Scanned by CamScanner

খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পৃথিবীতে অলংকারবিহীন কবিতা খুব কমই রচিত হয়েছে। তবে এই অলংকারের ব্যবহার সর্বত্র সমান নয়। কোনো কোনো কবির অলংকার ব্যবহারের দিকে ঝোঁক একটু বেশি, আবার কেউ কেউ নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া অলংকার ব্যবহার করেন না। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হাজার অলংকার ব্যবহার করেও সার্থক কাব্য রচনা করতে কখনো কখনো ব্যর্থ হয়েছেন, আবার রবীন্দ্রনাথ অল্প অলংকারেও কালজয়ী কবিতা লিখেছেন। অলংকার থাকলেই যে রচনা কাব্য হয় না তার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'সাহিত্যদর্পণ' এর একজন টীকাকার অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার সমন্বিত এমন একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন যাকে কেউ কাব্য বলবে না :

"তরঙ্গনিকরোন্নীততরুণীগণ সংকুলা।
সরিদ্ বহতি কল্লোলব্যূহব্যাহততীরভূঃ।।"

কিংবা বাংলা থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্ :

"যখন যাবে জামের বনে জবাগাছের নীচে দিয়ে জলের সঙ্গে যেও।"

উল্লিখিত উদাহরণটিতে অনুপ্রাসের একটি চমক আছে। তবু পংক্তিটি কাব্য হয়নি। অথচ বাংলা সাহিত্য থেকে এমন কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা যায়, যেগুলি অলংকারের বাহুল্যে ঢাকা না পড়া সত্ত্বেও হয়ে উঠেছে অসাধারণ কাব্য। প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশি' কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি :

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।

কবিগুরুর এই স্মরণীয় পংক্তিগুলিতে অলংকারের সামান্যতম ব্যবহারও নেই অথচ এর মতো কাব্য সমগ্র বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। ব্যর্থ প্রেমিকের বেদনা এখানে বিরহের অতল থেকে উঠে এসে নিরাভরণ ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাষা আভরণহীন হলেও বেদনার গভীরতা তাতে বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। অলংকারহীন হয়েও কবিতা যে কাব্যিক সত্যকে কত গভীরভাবে ছুঁতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতার উদ্ধৃতাংশ তার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের মতো জয় গোস্বামীর কবিতাতেও এমন নিদর্শন দুর্লভ নয়। তাঁর এমন দুটি ছোট কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে সামান্য অনুপ্রাস ছাড়া কোনো অলংকারই নেই, তবু তা সার্থক কাব্য হয়ে উঠেছে। যেমন :

"ওই মেয়েটির কাছে
সন্ধ্যাতারা আছে" (শ্রাবণ)

কী অসাধারণ কৌশলে সন্ধ্যাতারার অনুষঙ্গে মেয়েটির হৃদয়ের মায়াবী আলোয় ঘেরা অপূর্ব রোমান্টিকতার ছবিটি কবি এখানে পরিস্ফুট করেছেন তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। একই ভাবে তিনি যখন লেখেন :

"তোমার মাথায় পাড়ে সারাদিন কাগে বগে ডিম
রাত্রে বশ হয় দানো, হাতে আনো জাদুর পিদ্দিম!" (কবি)

তখন কি তিনি সেই মানুষগুলির কথাই বলতে চান না যাঁরা নিজের মুদ্রাদোষে আলাদা হয়ে যান বলেই কবি খ্যাতি অর্জন করেন। বাস্তববাদী কেজো মানুষের কাছে যে সমস্ত ভাবনা কাগে বগে ডিম পাড়া হাবিজাবির নামান্তর, কবির কাছে তা-ই তো রাত্রির কোনো এক নীরব-নিস্তব্ধ

Scanned by CamScanner

মুহূর্তে জাদু প্রদীপ হয়ে যায়; আর তার অদ্ভুত মায়াবী আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পাঠক। এ ভাবেই বাগে বগে ডিম পাড়া ও জাদু-প্রদীপের অনুষঙ্গে সৃজনশীল কবির মৌলিক ভাবনা ও সেই ভাবনাজাত অসাধারণ সৃষ্টির কথা জয় এখানে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। মিলের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে দুটি কবিতাতেই যে অন্ত্যানুপ্রাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাকে অতিক্রম করে গেছে কবিতা দুটির কাব্যধর্ম—অন্তর্নিহিত অর্থদ্যোতনা। অনুরূপভাবে কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত বর্ণনার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুও অলংকারবিহীন হয়েও হয়ে উঠেছে সার্থক কাব্য :

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।।"

"সৌন্দর্যম্ অলংকার"

বামন তাঁর অলংকার বিষয়ক আলোচনাকে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ অলংকার অর্থাৎ শব্দ ও অর্থালংকারের মধ্যে সীমিত রাখেননি। তিনি অলংকারের বিস্তৃত অর্থ করেছিলেন, যা বোঝা যায় তাঁর অলংকার বিষয়ক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করলে। 'কাব্যম্ গ্রাহ্যমলংকারাৎ' এই সূত্রটি দেওয়ার পর তিনি পরবর্তী সূত্রে বলেছিলেন, 'সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ'। এই সৌন্দর্য বলতে আসলে কি বোঝায় তা জানার প্রয়োজন আছে। বামন তাঁর দ্বিতীয় সূত্রে অলংকার শব্দেরই অর্থ করেছেন সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যের জন্যই কাব্য পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয়। সৌন্দর্য পাঠকের মনে আনন্দ ও রসের উদ্রেক ঘটায়। "A thing of beauty is joy for ever." কাব্যের জগৎ সৌন্দর্যের জগৎ হলেও দৈনন্দিন কথাবার্তা কিংবা আলাপচারিতার মধ্যে আমরা সৌন্দর্য খুঁজি না। কারণ দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে নিছকই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অলংকার যেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয় সেখানেই অলংকার যোজনার সার্থকতা। সার্থক কবিদের হাতে অলংকার কখনই কাব্যশরীরের বোঝা হয়ে ওঠে না, তা কাব্যের সৌন্দর্যকে টেনে বার করে আনে। আর যেখানে অলংকারের জন্যেই অলংকার ব্যবহৃত হয় সেখানে তা কাব্যসৌন্দর্যের হানি ঘটায়। কাব্যের এই সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে কাব্যকে দোষ মুক্ত করে গুণযুক্ত করতে পারলে কিংবা অনুপ্রাস, উপমাদি প্রভৃতি অলংকার যুক্ত করতে পারলে।

অলংকারের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যদর্শ' নামক গ্রন্থে। দণ্ডী বলেছেন, "কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে" অর্থাৎ কাব্যের যে সমস্ত ধর্ম তার শোভা সম্পাদন করে তাই অলংকার। খানিকটা একই সুরে কথা বলেছিলেন আলংকারিক ভামহ। তাঁর মতে, "সুন্দরীর মুখচ্ছবি যত কমনীয় হোক না কেন, ভূষাহীন হলে তা কখনই শোভা পায় না।" ভামহ আসলে বলতে চেয়েছেন সুন্দরীর মুখচ্ছবিতে অলংকার যোজিত হলে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। রমনীর ক্ষেত্রে যা সত্য কাব্যের ক্ষেত্রেও সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। কাব্য যত সুন্দরই হোক না কেন, তার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে অলংকার। তবে এই অলংকারগুলি কেবল শব্দ ও অর্থালংকার নয়, বামন অলংকার বলতে আরও অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন।

বামন যে কোনো রকম সৌন্দর্যকেই অলংকার বলে অভিহিত করেছিলেন। সৌন্দর্য ও অলংকার বামনের কাছে সমার্থক হয়ে উঠেছিল। অলংকার যেমন কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করে তেমনি রীতি ও গুণগুলিও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়। তাই অলংকার, রীতি, গুণ এসব কিছুকেই বৃহত্তর অর্থে অলংকার বলা যেতে পারে। বামন কাব্য প্রসঙ্গে অলংকারের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তাকে যে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করেছিলেন সেটি না বুঝলে বামন সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে যাবে।

Scanned by CamScanner

তৃতীয় অধ্যায় | রীতিবাদ

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য"

'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' ও 'কাব্যম্ গ্রাহ্যমলংকারাৎ' মত দুটি বিরুদ্ধবাদী মনীষীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। তখন অলংকারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর একদল আলংকারিক রীতিবাদের জন্ম দেন। রীতিবাদীদের মতে কাব্যের আত্মা অলংকার নয়, কাব্যের আত্মা হল রীতি। অলংকার ও রীতির মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃত আলংকারিকেরা আর একটি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিষয়টি 'গুণ' নামে পরিচিত। আচার্য ভরত, ভামহ, দণ্ডী, এঁরা প্রত্যেকেই গুণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গুণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনাই সংস্কৃতে রীতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। গুণ সম্পর্কে ভাবনার ফলশ্রুতিতে রীতিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্মান আলংকারিক বামনেরই প্রাপ্য। বামন কাব্যাত্মার সন্ধান করতে গিয়ে ক্রমশই অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমে কাব্যের গ্রাহ্যতার প্রসঙ্গে অলংকারের কথা বলে তিনি অলংকার বলতে সৌন্দর্যকে বোঝান। আবার এই সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি প্রচলিত অলংকার, গুণ, রীতি—এসব কিছুকেই ঠাঁই দিয়েছিলেন। তবে 'রীতি'র সঙ্গে সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও প্রচলিত অলংকারগুলির সঙ্গে রীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অলংকারবাদের বিরোধিতা করেই রীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রীতিবাদীদের মতে অলংকৃত বাক্যমাত্রই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে, তার কারণ কাব্যের আত্মা হল রীতি—"রীতিরাত্মা কাব্যস্য।" এই রীতি আসলে পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, নির্দোষ অবয়ব সংস্থান। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত রীতির সঙ্গে ইংরেজি স্টাইলের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে।

"অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব সংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান।"

এখন জানা দরকার অবয়ব সংস্থান বলতে আমরা কি বুঝি। ধরা যাক্ একজন মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়ছেন। তাঁর কাছে উপকরণ হিসাবে আছে কাদা বা মাটি। এই উপকরণটিকে তিনি মূর্তি রচনার কাজে লাগাবেন। উপকরণটি মূর্তি রচনার কাজে লাগালেও যথেচ্ছ উপকরণ ব্যবহার কখনই শিল্পীর লক্ষ্য হবে না। কারণ তিনি জানেন যে কোথায় কতটুকু মাটি দিলে মূর্তির সৌন্দর্য খুলবে। দর্শকের কাছে মূর্তিটি যাতে দৃষ্টিনন্দন হয়, তার জন্যে শিল্পীর আয়োজনের ত্রুটি থাকে না। তাই যিনি প্রথম শ্রেণীর মৃৎশিল্পী তিনি কখনই পৃথুলউদর, একটা হাত সরু, একটা হাত মোটা, কিংবা একটা চোখ বড় ও একটা চোখ ছোট—এমন মূর্তি গড়েন না। প্রকৃত শিল্পীর হাতে মূর্তির অবয়ব নিখুঁত হয়ে ওঠে। এই নিখুঁত অবয়বে উপযুক্ত স্থানে অলংকার যোজনা করলে মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে মূর্তির একটা হাত সরু এবং অপর হাত মোটা কিংবা একটি কান লম্বা এবং অপর কান বেঁটে সেই মূর্তিকে চুড়ি কিংবা দুল পরালে তার সৌন্দর্য তো খুলবেই না বরং তার বীভৎসতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে মূর্তির অবয়ব সংস্থানই হল মুখ্য, আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া অলংকারগুলি হল গৌণ। মাটির

Scanned by CamScanner

মূর্তিটির ক্ষেত্রে অলংকারগুলি নির্দোষ অবয়বের আনুষঙ্গিক বস্তু হয়ে দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা কখনই অবয়বকে ছাপিয়ে উঠবে না। তাই মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখাবে না যদি তার অবয়ব সংস্থানের মধ্যে দোষ থেকে যায়।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই অবয়ব-সংস্থান, যা স্টাইল বা রীতি নামে পরিচিত, বিশিষ্ট পদরচনার ওপরেই তার সার্থকতা নির্ভরশীল। পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে শব্দ ও অর্থের নিপুণ সংযোজনা ও বিন্যাস চাতুর্যে। এর মধ্যে দিয়ে কবির অন্তরের স্বভাব ধরা দেয়।

'রীতিরাত্মা কাব্যসা' সূত্রের প্রবক্তা আচার্য বামনও রীতি বলতে পদরচনার বিশিষ্টতাকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর মতে পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে গুণযুক্ত হলে। পদ কীভাবে গুণময় হয়ে ওঠে তা বিচারের আগে 'পদ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে জেনে নেওয়া দরকার। আসলে 'পদ' কথাটির মধ্যে দিয়ে কাব্যদেহ বা কাব্যশরীরের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ কবিতার শরীরই যদি না থাকে তাহলে তা কখনই কাব্য পাবাচ্য হয় না। এই শরীরকে কেন্দ্র করেই দোষ এবং গুণ আধারিত হয়। বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য মানব-শরীরের উদাহরণ টানা যেতে পারে। মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে তখন মানুষের চোখে মুখে এমনকি সারা শরীরে নানারকম মালিন্য লেগে থাকে। এই মালিন্যগুলিই হল শরীরের দোষ, ঠিক যেন কাব্যদোষের মত। তাই সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব মালিন্য বা শারীরিক দোষগুলি দূর করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না। এর জন্য আমরা সকালবেলা উঠে দাঁত মাজি, চোখে মুখে জল দি এবং শেষমেশ নির্মল জলে স্নান করে পরিশুদ্ধ হই। সকালবেলা বিছানা পরিত্যাগ করে মানুষের এত পরিশ্রম, পরিচর্যা ও প্রচেষ্টার একটাই উদ্দেশ্য হল শরীরটাকে দোষমুক্ত করা। স্নানান্তে দোষমুক্ত শরীরে আমরা যখন সুগন্ধী লেপন করি কিংবা নানা রকম প্রসাধনে নিজেদের ঝরঝরে করে তুলি তখনই আমাদের শরীরে গুণযুক্ত হয়। হলুদ, চন্দন, সুগন্ধী, আতর এগুলির যোজনা যেন মানব-শরীরে গুণের সংযোজন করা। এই গুণগুলিই মানুষকে নিমেষের মধ্যে বদলে দিয়ে নতুন করে তোলে।

কাব্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকাংশে একরকম। কাব্যকেও দোষমুক্ত করে গুণযুক্ত না করতে পারলে তা কখনই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। কাব্যের কায়া নির্মাণের জন্য কবি যে পদসন্ধান করেন তা নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ পদ নয়। কাব্যে ব্যবহৃত পদ সব সময়েই গুণময় এবং গুণময় বলেই তা বিশিষ্ট। অর্থাৎ বিশিষ্ট পদ মাত্রই গুণময় পদ। কিন্তু পদ গুণময় হলেই তাকে রীতি বা কাব্য কোনোটাই বলা যাবে না। কবি মনে মনে একটি গুণময় পদ চিন্তা করলেন, কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করলেন না, তাহলে সেটি যেমন কাব্য হবে না, তেমনি তাকে রীতিও বলা যাবে না। রীতির সঙ্গে রচিত হয়ে ওঠার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ কাব্যদেহের অন্তর্গত পদগুলি গুণযুক্ত হলে এবং তা রচিত হলে তখনই তাকে আমরা রীতি বলতে পারবো। বিষয়টিকে সূত্রায়িত করলে দাঁড়ায় :

পদ (দেহ) + গুণ + রচনা = রীতি (বামনের মতে এটিই হল কাব্যের আত্মা)

ভারতীয় আলংকারিকগণ কাব্যের একাধিক গুণের কথা বলেছেন। এ রকমই কয়েকটি গুণ হল ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য, কান্তি, উদারতা, সমতা, শ্লেষ প্রভৃতি। কিন্তু এই গুণগুলির সঙ্গে

Scanned by CamScanner

"ধ্বনিবাদ ও শব্দার্থশক্তি"

এক তলার থেকে আর এক তলায় উঠতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। আমরা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এক একটা সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে যাই ওপরে। কাব্যের রহস্য-আবিষ্কারও অনেকটা সিঁড়ি ভাঙ্গার মত। সংস্কৃত আলংকারিকগণ একদিনেই কাব্য-রসসাগরের সন্ধান পাননি। বেশ কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছেছিলেন কাব্যের কাঙ্ক্ষিত জগতে। কাব্যাত্মার সন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে আমরা বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছি। দেহাত্মবাদ, অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। এবারে আর একটি নতুন সিঁড়ি অতিক্রম করার পালা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ এই সিঁড়িটির নাম দিয়েছেন ধ্বনিবাদ।

ধ্বনিবাদ আসলে কি, কবে কার হাতে প্রথম তার জন্ম সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। ধ্বনিবাদের আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য আনন্দবর্ধন ও তাঁর বিখ্যাত 'ধ্বন্যালোকঃ' গ্রন্থের কথা আমাদের প্রথমেই মনে আসে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের উদ্ভাবক ছিলেন না। এমন কোনো দাবিও আনন্দবর্ধন কখনো করেননি। তিনি ছিলেন সংকলক। তবে নিছক সংকলক বলে তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এই তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি এতদিন ছড়ানো-ছিটানো ছিল। আনন্দবর্ধনই সেগুলিকে একত্রিত করে ধ্বনির আলোকে আমাদের আলোকিত করেছেন। ধ্বনিবাদ এমনই এক জোড়ালো মতবাদ ছিল যে এর প্রভাবে অলংকারবাদ ও রীতিবাদের প্রাধান্য নষ্ট হতে থাকে। ধ্বনিবাদের বিস্তৃত আঙিনায় অলংকার, গুণ, রীতি—এসব কিছুই ঠাঁই করে নেয়। এমনকি ধ্বনিবাদের পরবর্তী রসবাদও তার বিরোধিতা করেনি। ধ্বনিবাদ রসবাদের পরিপূরক হওয়ায় আলংকারিকদের দৃষ্টি ধ্বনিবাদের প্রতি খুব বেশি মাত্রায় পড়েছিল।

'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য' সংস্কৃত আলংকারিক প্রদত্ত এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে ভূমিকা হিসাবে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ধ্বনির স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি পারিভাবিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত জরুরি। এটিকে 'শব্দার্থ শক্তি' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কাব্য হ'ল শব্দময় শিল্প। শব্দের ইষ্টক দিয়েই নির্মিত হয় কাব্যের হর্ম্য। শব্দ দিয়ে কাব্য শরীর গড়ে ওঠে বলে শব্দ দিয়েই আমরা কাব্যকে ছুঁই। তাই যে কোনো কাব্য রসিকেরই শব্দার্থশক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি।

আনন্দবর্ধন প্রমুখ আলংকারিকগণ ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে শব্দের চার রকম শক্তির কথা বলেছেন। এগুলি হ'ল (১) অভিধাশক্তি (২) লক্ষণাশক্তি (৩) তাৎপর্যশক্তি ও (৪) ব্যঞ্জনাশক্তি।

অভিধাশক্তি : যে শক্তি বলে একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থকে বোঝায় তাকে অভিধাশক্তি বলে। এটিকে শব্দের প্রচলিত অর্থ বলা যেতে পারে। যেমন যদি বলা হয়

Scanned by CamScanner

'বৃদ্ধ' তাহলে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একজন পরিণত বয়স্ক মানুষকেই বোঝাবে। 'বৃদ্ধ' বললে আমাদের মনে অল্পবয়স্ক কোনো শিশু কিংবা কিশোরের কথা মনে আসবে না। শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক জ্ঞান পূর্ব থেকে না থাকলে অভিধাশক্তির দ্বারা সংকেতিত মুখ্য অর্থের ধারণা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে কোনো দিন বুড়োমানুষ দেখেনি তার কাছে যদি 'বৃদ্ধ' শব্দের অর্থ জানতে চাওয়া হয় তাহলে পরিণত বয়স্ক একটি মানুষের কথা তার মনে কখনই আসবে না। শব্দের সঙ্গে অর্থের যে অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে সেটি মানুষের মনে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই কারণেই 'গাঁদাফুল' বললে আমরা সাদা কোনো ফুল ভাবি না কিংবা 'গাড়ি' বললে 'বাড়ি' ভাবি না। অভিধাশক্তির দ্বারা সংকেতিত অর্থকে অর্থাৎ মুখ্য অর্থকে অভিধেয় অর্থ, বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ বলে। যেমন বৃদ্ধ শব্দের অর্থ বয়স্ক বা পরিণত বয়স্ক।

লক্ষণাশক্তি : যে শক্তির বলে একটি শব্দ মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ ছাড়া মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আর একটি অর্থ কে বুঝিয়ে থাকে, তাকে লক্ষণা বলে। শব্দের অভিধেয় অর্থ বা মুখ্যার্থ যদি বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থ পরিস্ফুটনে অক্ষম হয় তাহলে আমরা লক্ষণার দ্বারস্থ হই। "জীবনানন্দ ভালো করে না পড়লে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না" এখানে মুখ্যার্থ ধরে যদি সমগ্র বাক্যটির অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে বাক্যটির অর্থ ঠিক বোঝা যাবে না। জীবনানন্দ ছিলেন একজন মানুষ। তাঁকে ভালো করে পাঠ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি জীবনানন্দকে পাঠ করার কথা বলা হয়নি, তাঁর সাহিত্যকর্মকে বোঝানো হয়েছে। এখানে মুখ্যার্থ গ্রহণে বাধা আছে বলেই আমরা একটি গৌণ অর্থ ধরে বাক্যটির অর্থ করলাম। যখন অভিধাশক্তি শব্দের মুখ্যার্থকে বুঝতে বাধা দেয় তখন যে শক্তির সাহায্যে আমরা অভিধা, বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি তাকেই বলে লক্ষণাশক্তি। এই শক্তির দ্বারা আমরা যে গৌণ অর্থকে বুঝে থাকি তাকে লক্ষ্যার্থ বলে।

এই লক্ষণাকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে (১) রূঢ়ি লক্ষণা (২) প্রয়োজন লক্ষণা। 'রূঢ়ি' শব্দের অর্থ হল লোকপ্রসিদ্ধি। যেমন 'অসভ্য চীন অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন তারাও মহান'। এই কাব্যপংক্তিটির মুখ্যার্থ ধরে যদি অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে আমাদের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে। একটা দেশ কখনো অসভ্য, স্বাধীন কিংবা মহান হতে পারে না। এখানে চীন ও জাপান বলতে ভৌগোলিক ভূখন্ড কে বোঝানো হয়নি। চীন ও জাপান দেশের মানুষকে বোঝানো হয়েছে। চীন-জাপানবাসীকে বোঝাতে উল্লিখিত পংক্তিতে শুধু 'চীন' ও 'জাপান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে যদি বলা হয়, 'আমি নজরুল পড়তে ভালোবাসি' তবে নজরুল বলতে নজরুলের রচিত সাহিত্যকেই বোঝাবে। এই উদাহরণ গুলির সবই লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ বলে এগুলি রূঢ়ি লক্ষণার উদাহরণ। এখানে চীন, জাপান ও নজরুল হল লক্ষক; আর চীন ও জাপানবাসী এবং নজরুলের 'সাহিত্য' হল লক্ষ্য। উদাহরণ গুলিকে 'রূঢ়ি' বলার কারণ এগুলি লোক ব্যবহারে পরিচিত। আমরা ওগুলিকে যে রকম করে বলা হয়েছে ও রকম ভাবে বলতেই অভ্যস্ত। 'নজরুল' শব্দটি দিয়ে যখন আমরা কাজ চালাতে পারি

Scanned by CamScanner

এবং লোকেও যখন তা বোঝে তখন আর আমরা অনর্থক নজরুলের রচিত সাহিত্য বা কাব্য—এমন ভাবে ভেঙে বলি না।

'প্রয়োজন লক্ষণা'ই হল প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধি লক্ষণা। রূঢ়ি লক্ষণা অপেক্ষা তা অনেক উন্নত স্তরের। যেখানে লক্ষণার মূলে কোনো প্রয়োজন থাকে তাকে 'প্রয়োজনলক্ষণা' বলে। এটি আসলে কি তা ব্যাখ্যাযোগ্য। যেমন :

"এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা"

এখানে সোনার মুখ্য অর্থ মূল পংক্তিটির সঙ্গে সংগতি বিধায়ক নয়। তাই শব্দটিকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করতেও অসুবিধা হয়। কিন্তু 'সোনাকে' গৌণ অর্থে অর্থাৎ 'ঐশ্বর্য' 'সমৃদ্ধি' ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ করলে পংক্তিটির মধ্যে অর্থ-সংগতি রচিত হয়। অর্থ-সংগতির পাশাপাশি অর্থের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যও ঘটে। 'ঐশ্বর্য' ও 'সমৃদ্ধি' কে বোঝানোর প্রয়োজনে 'সোনা' শব্দটির ব্যবহার খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'আমি নজরুল পড়তে ভালোবাসি'— এই উদাহরণে নজরুল শব্দটি কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি। 'আমি নজরুলের সাহিত্য পড়তে ভালোবাসি' বললেও কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু 'সোনা' শব্দটিকে কবি রামপ্রসাদ যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে নিষ্ফল জীবনকে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধময় করে তোলার অর্থটি সুন্দর ফুটেছে। বিশেষ সুন্দর করে অর্থ প্রকাশের প্রয়োজনেই 'সোনা' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের তাই মনে হয় 'সোনা' শব্দটি ছাড়া 'ঐশ্বর্য' ও 'সমৃদ্ধি' কে যেন বোঝানোই যেতো না। 'সোনা শব্দের সূত্র ধরে আমরা যে 'ঐশ্বর্য' 'সমৃদ্ধি' ইত্যাদি সূক্ষ্ম গোপন অর্থের ইঙ্গিত পেলাম তাকে 'লক্ষণামূলক ধ্বনি' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রয়োজন লক্ষণার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

"বুকের মধ্যে বাঘ নিয়ে ঘুমিয়েছি কতকাল
এবার জেগেছে সে চরম প্রহরে।"

বুকের মধ্যে কোনো মানুষ বাঘ নিয়ে ঘুমোতে পারে না। তাই মুখ্যার্থে 'বাঘ' শব্দটিকে গ্রহণ করা যায় না। মুখ্যার্থ এখানে বাধিত। সুতরাং বাঘ বলতে এখানে অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে। সেটা হিংস্রতা, প্রতিহিংসা, বিদ্রোহী মনোভাব—এরকম অনেক কিছু হতে পারে। আগের উদাহরণটির মত এটিতেও যেহেতু সূক্ষ্ম গোপন অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাই এখানেও লক্ষণামূলকধ্বনি হয়েছে। গোপন সৌন্দর্য লাভের এই অভিপ্রায়কে অভিনব গুপ্ত 'প্রয়োজন' বলেছেন। রূঢ়ি লক্ষণায় যেহেতু আমাদের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না তাই রূঢ়ি লক্ষণা প্রয়োজন লক্ষণার মত উন্নত নয়।

রূঢ়ি এবং প্রয়োজন— উভয় লক্ষণাতেই মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের একটি সম্বন্ধ থাকে। তবে রূঢ়ি লক্ষণায় লক্ষ্যার্থের সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধ অনেক বেশি স্থূল। গোপন সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা তার নেই। রূঢ়ি লক্ষণা মুখ্যার্থকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যার্থের দিকে খুব বেশি দূর যেতে পারে না বলে তার থেকে গভীরতর কোনো অর্থ আবিষ্কৃত হয় না। অন্য দিকে প্রয়োজন লক্ষণার গভীরতা অনেক বেশি বলে তা গোপনতম সৌন্দর্য

Scanned by CamScanner

আবিষ্কারে সক্ষম হয়। কাব্য যেহেতু দেহের উপরিতল থেকে আত্মার দিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় তাই কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন লক্ষণার গুরুত্ব অনেক বেশি।

তাৎপর্যশক্তি : ব্যঞ্জনাবাদীদের অনেকেই তাৎপর্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও অভিনবগুপ্তের আলোচনায় তাৎপর্য শক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা সকলে জানি যে বহু শব্দ পাশাপাশি বসে একটি বাক্য গঠন করে। বাক্যের অর্ন্তগত প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ থাকে। আবার পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ বাক্যের মধ্যে অন্বিত হয়ে সামগ্রিক একটি অর্থ প্রকাশ করে। পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে অন্বয়বোধের দ্বারা যদি একটি অখন্ড অর্থকে প্রকাশ করে তবে তাকে তাৎপর্য শক্তি বলে। শব্দের চেয়ে বাক্যের অর্থই যেহেতু তাৎপর্য শক্তিতে গুরুত্ব পায় তাই সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্য বিচার' গ্রন্থে 'তাৎপর্য শক্তি'কে 'বাক্যশক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন 'আমি' 'ভাত' ও 'খাই' এই তিনটি শব্দের পৃথক পৃথক ভাবে একটি করে অর্থ আছে। কিন্তু এই তিনটি শব্দ যখন পাশাপাশি বসে একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলির তুলনায় বাক্যটির অর্থ তাৎপর্যগত ভাবে কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। এই সামগ্রিক বা অখন্ড অর্থটিকে তাৎপর্য বলা যেতে পারে।

শব্দের যে তিন শক্তি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা গেলো সেগুলি ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছিল। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে দেখালেন যে, শব্দের এই তিন শক্তি আসলে বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করে। সার্থক কাব্য বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যে গভীরতর অর্থের প্রকাশ ঘটায় এই তিন শক্তির সাহায্যে তাকে পাওয়া যায় না। ধ্বনিবাদীদের মতে, এই তিন শক্তির কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। অভিধাশক্তির দ্বারা লভ্য অর্থ সবচেয়ে আগে ফুরিয়ে যায়। লক্ষণাশক্তি শব্দের অর্থকে আরও কিছুদূর সম্প্রসারিত করে ঠিকই কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। অনুরূপ ভাবে তাৎপর্য শক্তির ক্ষমতাও খুবই সীমিত। কিন্তু শব্দের এমন একটি শক্তি আছে যার ক্ষমতা অসীম। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর তা থেমে যায় না। তা শব্দ ও অর্থের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অনেক অনেক বেশি অর্থ প্রকাশে সক্ষম। এই শক্তিকে সংস্কৃত আলংকারিকগণ 'ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত করেছেন। ব্যঞ্জনাশক্তির কোনো পরিমাপ করা যায় না—"ব্যঞ্জনং ন তুলাধৃতম"। যে কোন কাব্যে এই ব্যঞ্জনাশক্তিরই প্রাধান্য।

ব্যঞ্জনাশক্তি : যেখানে কাব্যের বাচ্যার্থ কোনো রকম বাধা না পেয়ে নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হয় অথচ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে পাঠক পাঠিকার মনে একই সময়ে আরও একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। আর যে শক্তির সাহায্যে এই ধ্বনির অর্থকে পাওয়া যায় তাকে ব্যঞ্জনাশক্তি বা ব্যঙ্গ্যশক্তি বলে। ধ্বনি থেকে আমরা যে অর্থ লাভ করি তাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ বলে। ধ্বনি থেকে প্রাপ্ত অর্থটিকে আমরা ঘন্টাধ্বনির অনুরণনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একটি ঘন্টা বেজে উঠেই তার কাজ শেষ করে না। দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুরণনের মাধ্যমে তার ক্রিয়া চলতে থাকে। ঠিক সে রকমই সার্থক কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় পাঠকদের চিত্তে যে বাচ্যার্থের বোধ জন্মায় তা-ই তাদের নিয়ে যায় বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অনেক দূরে। এই সূত্রে পাঠকদের চিত্তে নূতন একটি অর্থের সূক্ষ্ম-স্পন্দন অনুভূত

Scanned by CamScanner

হতে থাকে। এই নূতন অর্থটি হল বাঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে 'প্রতীয়মান অর্থ' কে নারীদেহের লাবণ্যের সঙ্গের তুলনা করা হয়েছে। নারীদেহের লাবণ্য দেহ কে আশ্রয় করে থাকলেও যেমন দেহকে ছাপিয়ে ওঠে, ঠিক সেই রকমই মহাকবিদের বাণীতে এমন একটি বস্তু থাকে যা কাব্যশরীরকে আশ্রয় করে থেকেও তাকে অতিক্রম করে যায়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য' থেকে একটি চির পরিচিত উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অঙ্গিরা হিমালয়ের কাছে মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে কালিদাস লিখেছেন :

"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥"

এর সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী :

"দেবর্ষি যবে কহিলা একথা
পিতার পার্শ্বে পার্ব্বতী নতাননী
হেরিতে লাগিল লীলাকমলের
দলগুলি গণি গণি।"

এই অংশটির কাব্যত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলবে না। কোনো অলংকারের সুষমায় এর কাব্যত্ব নয়, কারণ সে রকম কোনো অলংকারই এখানে নেই। ধ্বনিবাদীরা এর কাব্যত্ব 'লীলাকমলের পত্রগণনা'র মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। কারণ তা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে সহৃদয় পাঠককে অর্থান্তরে নিয়ে যায় এবং তার থেকে পূর্বরাগের লজ্জার ব্যঞ্জনা উৎসারিত হয়। অঙ্গিরার বিবাহ-প্রস্তাবে পার্বতীর মনে রতি (প্রেম) উদ্দীপিত হয়েছে। এই উদ্দীপিত রতির স্বাভাবিক ফল হল হর্ষ, যা অবশ্যম্ভাবী ভাবে চোখ মুখে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই হর্ষজনিত বিকার প্রকাশিত হওয়ার আগেই সামনে গুরুজন থাকায় তার লজ্জা এসেছে। 'লজ্জা' তার 'অবহিত্থা' নামক গৌণ বাসনাকে জাগিয়ে দেয়। 'অবহিত্থা' সঞ্চারী বা ব্যভিচারী হলেও ভাব। কিন্তু এই ভাব যে জেগেছে তা বোঝা যায় পার্বতীর নতুন বিকারে বা আচরণে। যার প্রমাণ আছে মুখ অবনত করায় ও লীলাপদ্মের পত্র গণনায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবি এখানে ব্যঞ্জনায় যে বক্তব্যটি উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তা সরাসরি ভাবে না বলে কিছুটা ইঙ্গিতে বলেছেন। এই ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করতে না পারলে, আমরা এর প্রতীয়মান অর্থটুকু বুঝতে পারবো না। ইংরাজীতে একেই বলে 'Suggested Sense'। এই ইঙ্গিতের অভাব ঘটলে, অর্থাৎ Flat করে কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত হলে, তা আর যাই হোক প্রথম শ্রেণীর কাব্য হবে না। কালিদাসের শ্লোকটিকেই যদি আবরণ না দিয়ে সরাসরি বলা হত :

"বরের কথায় উমার হল পুলকের উদগম
নত মুখে লজ্জা পেয়ে বলল কথা কম"

তবে তার কাব্যমহিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মদনভস্মের পর' কবিতায় লিখেছিলেন :

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী।
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

Scanned by CamScanner

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।"

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর বক্তব্য বাচ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবমনের চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে তারই ইঙ্গিত করেছেন এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

এবারে আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর 'মাসিপিসি' কবিতাটি নেওয়া যাক :

"ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে
ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে

শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে
ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি ছাড়া কাপড় কাচে

দু-এক ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে
ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ট্রেন ধরতে আসে

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির মস্ত পরিবার
অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির পোঁটলা পুঁটলি কোথায়?
বেল বাজারের হোমগার্ডরা সাত ঝামেলা জোটায়

সাল মাহিনার হিসাব তো নেই জষ্টি কি বৈশাখ
মাসিপিসির কোলে কাঁখে চালের বস্তা থাক

শতবর্ষ এগিয়ে আসে—শতবর্ষ যায়
চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়"

এই কবিতায় বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার ব্যঞ্জনা। ব্যাচ্যার্থে মাসিপিসিদের চালের ব্যবসার কথা বলা হলেও ব্যঞ্জনায় যুগ যুগ ধরে অনাহারী, সংগ্রামী মানুষগুলোর পরিবর্তনহীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সভ্যতার বদল ঘটে, সময় এগিয়ে চলে, শতবর্ষ পার করে নতুন শতবর্ষের সূচনা হয় কিন্তু অনাহারী, অর্ধাহারী, সংগ্রামী মানুষগুলোর জীবনের ট্রাজিডির কোনো বদল ঘটে না। এক বৈচিত্র্যহীন বেঁচে থাকাকে সঙ্গী করে তাদের আজীবন কাটে। যে কোনো সার্থক কবিতার মত এখানেও ব্যাচ্যার্থকে আশ্রয় করে ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে গেছে।

এখন পর্যন্ত আমরা কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে কবিতার ব্যঙ্গার্থ আসলে কি হ বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছি। তবে মনে রাখা দরকার যে কেবল শব্দার্থের জ্ঞান থাকলে কবিতার ব্যঙ্গার্থকে বোঝা যাবে না। আবার ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝতে গেলে বাচ্যার্থের ব্যাপা যত্নশীল হওয়া দরকার। কারণ সহৃদয় পাঠকের মনে যে ব্যঙ্গ্যার্থের জন্ম নেয় তা বাচ্যার্থে পথ বয়েই। যেমন উপযুক্ত আলো পেতে গেলে প্রদীপ শিখার ব্যাপারে যত্নশীল হ

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাচ্যার্থে সন্দেহ অলংকার থাকলেও ব্যঞ্জনায় উপমাকে আভাসিত করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যঞ্জনাকে ধ্বনি বলা যাবে না। কারণ এখানে কবি এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। আমরা ধ্বনি বলতে যা বুঝি, যা বাচ্য, অলংকার সব কিছুকে ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তোলে তা এখানে নেই। এবারে বাংলা কবিতা থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

"হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত"

এখানে 'অশ্রুশিশির' কোন্ অলংকার তা নিয়ে পাঠকের মনে সংশয় জাগে। অশ্রু, শিশিরের মতন বলে অশ্রু অর্থাৎ উপমেয়কে প্রাধান্য দিলে অলংকারটিকে উপমা বলতে হয়। আবার অন্যদিকে অশ্রু ও শিশিরের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে (অশ্রু রূপ শিশির) যদি উপমান শিশিরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে অলংকারটিকে রূপকও বলা যেতে পারে। সুতরাং এখানেও এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা করা হয়েছে । কিন্তু এখানে অলংকারের যে ব্যঞ্জনাটুকু আছে তা শ্রেষ্ঠধ্বনিকে ছুঁতে পারেনি। সুতরাং "যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নয়। যে ধ্বনি কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলংকারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়"। সমাসোক্তি কিংবা সংকর অলংকারে সেই ব্যঞ্জনা থাকে না।

● "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য"

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা একদিনে হয়নি। কাব্যের শব্দার্থ, অলংকার ইত্যাদির আলোচনা বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। বস্তুবাদী আলংকারিকগণ তাঁদের আলোচনায় ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাননি। কাব্য যে তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে কথার অতীতলোকে পাঠককে নিয়ে যায়, এ ধরনের কথাবার্তা তাঁদের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বার বার ঘুরপাক খেয়েছেন বাচ্য, গুণ, অলংকার ইত্যাদির জগতে। ধ্বনিবাদীরা যে ধ্বনিকে 'অপূর্ববস্তু' বলে উল্লেখ করেছেন, বস্তুবাদীরা তাকেই খুঁজে পেয়েছেন কাব্যের শোভা, গুণ ও অলংকারের মধ্যে। এ সবের অতিরিক্ত ধ্বনি বলে কিছু নেই বলেই তাঁদের বিশ্বাস ছিল। আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যা বস্তুবাদী আলংকারিকদের মনোরথ পূর্ণ করতে পারে• :

"যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্য চ যৎ।
কাব্যং তদধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥"

"যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচনবিন্যাসে যা রচিত নয়

Scanned by CamScanner

এবং অর্থ যার অলংকারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের রীতিতে (অর্থাৎ ফ্যাশনের খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে 'ধ্বনি'র স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করেছে, এ তো জানা যায় না"। মনোরথের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা খুব সহজে হয়নি। সে যুগে ধ্বনিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষ খাড়া হয়েছিল। তাই বিভিন্ন রকম সংশয় কাটিয়ে আচার্য আনন্দবর্ধনকে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে বিশেষ যত্নবান হতে হয়েছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যুক্তির জাল বিছিয়ে, বিরুদ্ধ মতবাদীদের সকল বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা'—এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

ধ্বনির লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে ধ্বনিবাদীরা ভূমিকা হিসাবে কাব্যের দুটি অর্থের কথা বলেছেন— (১) বাচ্য অর্থ (২) প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্য অর্থ বলতে কি বোঝায় সে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু মহাকবিদের বাণীতে বাচ্য অর্থের অতীত আর এক অর্থ থাকে যাকে প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ বলা হয়। এ অনেকটা রমণীদেহের লাবণ্যের মত। নারীদেহের লাবণ্য যেমন দেহকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেও দেহকে ছাড়িয়ে যায়, তেমনি মহাকবিদের বাণীতেও এমন কিছু থাকে যা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়। পৃথকভাবে প্রতীত এই প্রতীয়মান অর্থটির সন্ধান সহৃদয় পাঠক ছাড়া অন্য কেউ পায় না। এর সঙ্গে কাব্যের ব্যবহৃত শব্দ, গুণ কিংবা অলংকারের কোনো সম্পর্কই নেই। এবারে একটি উদাহরণ দিয়ে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আনন্দবর্ধন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন :

"ভ্রম ধার্ম্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্ত সিংহেন"

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছিল

"ভ্রমণ কর গো ধার্মিক তুমি
গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে—
ভয় পেতে সেই কুকুর নিহত
দৃপ্ত সিংহ এসেছে বনে।"

এই উদাহরণে ধ্বনি কোথায় লুকিয়ে আছে সেটি জানার জন্যে ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কোনো নায়িকার প্রিয়মিলনকুঞ্জে এক তপস্বী এসে সর্বদা পত্রপুষ্প ছিঁড়ে স্থানটির শোভা নষ্ট করত। তপস্বীর আগমন জনিত কারণে মিলনস্থানটির গোপনীয়তাও ব্যাহত হত। নায়িকা সাধুটির এ কাজ পছন্দ না করলেও একদিন তাকে গোদাবরী তীরে কুঞ্জবনে ভ্রমণ করতে বলল এবং তাকে আরও জানালো, যে কুকুরটাকে সে ভয় পেতো সেই কুকরটা নদীতীরে আগত একটি ভয়ঙ্কর সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে। এখানে বুদ্ধিমতী প্রেমিকা ইঙ্গিতধর্মী কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে নিজ কার্য সিদ্ধ করেছে। এখানে বাচ্যবস্তু হল 'ভ্রমণ কর গো'—এই বিধি। কিন্তু ব্যঞ্জনায় যে বস্তুটি পাওয়া যায় তা হল নিষেধ। অর্থাৎ সাধু যে কুকুরটিকে ভয় পেতো সেটি নিহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার জায়গায়

Scanned by CamScanner

এসে হাজির হয়েছে ভয়ঙ্কর এক সিংহ। সুতরাং সাধুর পক্ষে বনে গমন নিরাপদ হবে না। এই উদাহরণটির বাচ্যার্থ হল যেটা প্রতীয়মানার্থ ঠিক তার বিপরীত। এখানে বিধির মধ্যে দিয়ে নিষেধের ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে এটি একটি শ্রেষ্ঠধ্বনির উদাহরণ।

এ রকম বাচ্যার্থের নিষেধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থে বিধির প্রতীতিও হতে পারে :

"শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জিত, অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্রান্ধক শয্যায়াং মম নিমজ্জসি॥

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে

"ওগো রাত কানা প্রিয়—
যেথা শাশুড়ী ঘুমান বা ঘুমে অচেতন সেই ঠাঁই দেখে নিও।
আমি কোন্‌খানে ঘুমাই ভুলো না—মনে রাখা তব চাই,
রাত্রিতে ভুলে ওয়ো নাকো কভু আমার এ বিছানায়।"

এই শ্লোকের অর্থ হল, কোনো প্রোষিতভর্তৃকা নারীকে দেখে সেখানে আগত এক পথিকের কামোদয় হয়। তখন নারীটি পথিককে জানায় যে তার শাশুড়ী কোন্‌খানে অচেতনভাবে নিদ্রা যায় এবং সেই বা কোন্‌খানে নিদ্রা যায়। রাতকানা পথিক যেন তাদের ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে। এখানে বাচ্যার্থে পথিককে নিষেধ করা হলেও ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত প্রতীয়মান অর্থে নারীটি পথিককে তার শয্যায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখানে বাচ্য অর্থের ঠিক বিপরীত অর্থ প্রতীয়মান অর্থ থেকে লাভ করা যায়। তাই এটিও একটি প্রথম শ্রেণীর ধ্বনির উদাহরণ।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যখন বৃষ্টি নামলো' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। এই কবিতার শেষ স্তবকটি নেওয়া যাক :

"বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা
হয়তো মেঘে বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।"

আপাত সরল এই কবিতটির মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীরতর ব্যঞ্জনা। বাচ্যার্থের সিঁড়ি বেয়েই আমাদের পৌঁছাতে হয় সেই ব্যঞ্জনার জগতে। উদ্ধৃত অংশটির প্রথম চার পংক্তিতে যে বাচ্যার্থ আছে তার অর্থ উপলব্ধিতে পাঠকের কষ্ট হয় না। কিন্তু বাধা পেতে হয় শেষের দুই পংক্তিতে এসে। এখানে আর আক্ষরিক অর্থে পংক্তি দুটিকে গ্রহণ করা চলে না। অন্তর, আকাশ নয়, তাই সেখানে মেঘ ঘনিয়ে উঠতে পারে না। আর সেই মেঘ থেকে জলও ঝরে পড়ে না। সুতরাং কবির চিত্রকল্প রচনার উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল তা সহৃদয় পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে। সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় কবিরা

Scanned by CamScanner

একই ভাবে গৃহীত নাও হতে পারে। বাচ্যার্থ সংকেতের ওপর নির্ভরশীল বলে তার স্বরূপ মোটামুটি এক। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ যেহেতু সহৃদয়ের সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল তাই ব্যক্তিভেদে তার পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ একই কাব্য পাঠ করে সকল সহৃদয় পাঠক যে একই ব্যঙ্গ্যার্থে গিয়ে পৌঁছাবে এমন কোনো কথা নেই। সহৃদয় ভেদে সংস্কার ভিন্ন হওয়ার কারণে ব্যঙ্গ্যার্থও বদলে যায়।

পঞ্চমত : বাচ্যার্থের প্রতীতির কারণ শব্দজ্ঞান, অর্থজ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির কারণ সহৃদয়তা বা সহৃদয় সামাজিকের ভাবয়িত্রী প্রতিভা।

ষষ্ঠত : বাচ্যার্থ কেবলমাত্র বোধ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃতিও সঞ্চারিত করে।

● ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ :

আনন্দবর্ধন কেবল কাব্যে ধ্বনির গুরুত্ব নিরূপণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি ধ্বনির শ্রেণীবিভাগও করেছিলেন। তিনি ধ্বনিকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (১) অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি এবং (২) বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি।

অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি—যেখানে বাচ্যার্থ একেবারেই উদ্দিষ্ট নয় কিংবা যেখানে বাচ্যার্থ থেকে একেবারে তার বিপরীত অর্থের অবগতি হয় তাকে অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি বলে। এ জাতীয় ধ্বনিতে কবির উক্তিটি বাচ্য অর্থে পাঠক গ্রহণ করুক এটা কবি চান না। কবি এখানে শব্দ প্রয়োগ করেন লাক্ষণিকভাবে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। পাঠক লক্ষণার প্রয়োজনটি অর্থাৎ গোপন সৌন্দর্যটি ব্যঞ্জনায় আবিষ্কার করে আনন্দ পান, এটাই থাকে কবির অভিপ্রায়।

এই অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি দু রকমের (ক) অর্থান্তরসংক্রমিত (খ) অত্যন্ত-তিরস্কৃত।

অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যধ্বনি— অর্থান্তরসংক্রমিত ধ্বনিতে বাচ্য অর্থ তার নিজের অর্থটি বজায় রেখে অর্থান্তর বা অন্য অর্থে প্রবেশ করে। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এখানে বাচ্যার্থটি লক্ষক হয়ে নতুন অর্থের ব্যঞ্জনা করে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' থেকে এই ধ্বনির একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন :

"দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।"

দুর্যোধন কথাটার বাচ্যার্থ হল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র। আর এখানে 'তোদের' মানে হল প্রজাদের। এই তোদের অর্থাৎ প্রজাদের অপরাধ, তারা পাণ্ডবদের অনুরাগী। আজ বনগমনোদ্যত পাণ্ডবদের দেখবার জন্যে তারা পথে পথে "দীনবেশে সজল নয়নে" প্রতীক্ষা করছে। কবির 'দুর্যোধন' ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররূপ বাচ্যার্থটি বজায় রেখে যে নতুন অর্থের দ্যোতনা করতে যাচ্ছে, তার প্রথম পদক্ষেপ লক্ষণায়—"মূঢ় ভাগ্যহীন, ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।" এ পর্যন্ত প্রজাদের ওপর প্রতিশোধাত্মক বাক্যটি বলিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রয়োজনে একটি নতুন চারিত্রিক ধর্মে দুর্যোধনকে সংকীর্ণ করে এনেছেন। এ শুধু ধৃতরাষ্ট্রের

Scanned by CamScanner

পুত্র দুর্যোধন নয়, প্রতিশোধস্পৃহ দুর্যোধন। এখানে এসে লক্ষণার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু কবি এখানে এই কথাটির থেকে অন্য একটি অর্থে যেতে চেয়েছেন, সেটি হল, প্রতিশোধ নেওয়া দুর্যোধনের পক্ষেই সম্ভব। কারণ পাণ্ডবদের নির্বাসন তারই হীনতম চক্রান্তের ফল। সে কুটিল, হিংসা-পরায়ণ, ক্ষমতালিপ্সু, ষড়যন্ত্রকারী, পাণ্ডব-বিদ্বেষী এবং আরও কত কি। এখানে দুর্যোধন 'ধৃতরাষ্ট্রপুত্র' এই বাচ্যার্থটিই কবির একমাত্র অভিপ্রেত নয়, অথচ সেটিকে আচ্ছন্ন না করে কবি এখানে দুর্যোধন সম্পর্কে নানা মূর্তির ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ধ্বনি এখানে অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়ে গেছে। তাই এটি অর্থান্তরসংক্রমিত ধ্বনির উদাহরণ। এবারে আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

"আমি তোমাকে বলছি, তুমি ও কাজ করো না।"

এখানে 'বলছি' বলতে বোঝানো হয়েছে 'উপদেশ দিচ্ছি' কে। অর্থাৎ বাচ্য অর্থ এখানে অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়ে গেছে।

অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি—যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত অর্থাৎ দূরীভূত করে একেবারে বিপরীত অর্থ বোঝায় কিংবা নতুন অর্থের পথ ইঙ্গিত করে সরে পড়ে সেখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়। মম্মট এই ধ্বনির একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন।

"উপকৃতং বহুতত্র কিমুচ্যতে, সুজনতা প্রথিতা ভবতা চিরং।
বিদধদীদৃশমেব সদা সখে সুখিতমাস্স্ব ততঃ শরদাং শতম্।"

কোনও অপকারী ব্যক্তির প্রতি কেউ বলছে যে, আপনি বহু উপকার করেছেন ও বহু সৌজন্য দেখিয়েছেন—এরকম সৌজন্য দেখিয়ে আপনি একশো বছর বেঁচে থাকুন। কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য এখানে সম্পূর্ণ উল্টো—আপনি চিরকাল ধরে বহু অপকার করেছেন ও বহু অসৌজন্য দেখিয়েছেন—সম্ভব হলে আপনার আজই মৃত্যু হোক। এখানে বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত হয়ে বিপরীত অর্থকে বুঝিয়েছে বলে অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়েছে।

এই ধ্বনির এমন দৃষ্টান্তও দেওয়া যায় যেখানে দেখা যায় বাচ্যার্থ নতুন অর্থের পথ ইঙ্গিত করে সরে পড়েছে। অধ্যাপক অবন্তী কুমার সান্যাল একটি প্রাকৃত শ্লোকের মুক্তানুবাদের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন :

" আকাশ ছেয়েছে মত্ত মেঘেরা, বনে
অর্জুনশাখা দোলায় বৃষ্টিধারা,
ঘুচে গেছে সব চাঁদের অহংকারও
কালো কালো রাত তবুও হৃদয়হরা।"

এখানে "মত্ত" এবং "অহংকার" শব্দদুটিতে ধ্বনি লুকিয়ে আছে। মেঘ জড় পদার্থ, তাই তা মত্ত হতে পারে না। অনুরূপ ভাবে চাঁদেরও অহংকার থাকতে পারে না। এই দুটিকে বাচ্যার্থে গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু মত্ত বা মাতালের সাদৃশ্যে মেঘের অসংযম ও দুর্নিবাররূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। চাঁদের অহংকার ঘুচে গেছে বলায় চাঁদের মালিন্য, শোভাহীনতা ও উজ্জ্বলতার অভাব ধ্বনিত হয়েছে। এখানে 'মত্ত' ও 'অহংকার' দুটি শব্দের বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত। তাই এটিও অত্যন্ত-তিরস্কৃত ধ্বনির উদাহরণ।

Scanned by CamScanner

অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর 'অলঙ্কার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

"ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন, তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় এটি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি। 'অন্ধ' শব্দটির বাচ্য অর্থ দৃষ্টিহীন। ধৃতরাষ্ট্র যে বাইরে অন্ধ তা সত্য। কিন্তু অন্তরে কারও চর্মচক্ষু থাকে না, তাই অন্তরে অন্ধ কথাটার কোনো অর্থ হয় না। এখানে মুখ্যার্থ বাধিত। 'দৃষ্টিহীন' অর্থের অনুসরণে লক্ষণায় 'অন্তরে অন্ধ' মানে 'বিচারবোধহীন' পাওয়া যায়। এখানে 'অন্তরে অন্ধ' কথাটি কিছুই করতে পারেনি। লক্ষণার হাতে ভার দিয়ে সরে পড়েছে। এবং লক্ষ্যার্থ 'বিচারবোধহীন' ব্যঞ্জক হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অস্বাভাবিক বাৎসল্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে, আর এই অস্বাভাবিক বাৎসল্যের জন্যই দুর্যোধনের সমস্ত অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। এখানে বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত হওয়ায় উদাহরণটি অত্যন্ত-তিরস্কৃত ধ্বনির।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি—বিবক্ষিতান্যপরধ্বনির মূলে থাকে অভিধা। 'বিবক্ষিত' ও 'অন্যপর' শব্দ দুটি 'বাচ্য' এর বিশেষণ বলে এই ধ্বনিকে বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি বলে। অবিবক্ষিত ধ্বনিতে বাচ্য অর্থটি কবির অভিপ্রেত নয়, কিন্তু এখানে তার বিপরীত। অর্থাৎ বাচ্যার্থটিও এখানে বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত। এর তাৎপর্য হল এই যে এখানে বাচ্য আপনাকে বজায় রেখে ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশ করে এবং এই ব্যঙ্গ্যার্থটিই হয় মুখ্য। এখানে বাচ্য অর্থটি বাচ্য হয়ে থেকেও আর একটি অর্থকে অনুরণন ক্রমে ব্যঞ্জিত করে তাকে প্রধান করে তোলে বলে এটি প্রকৃত ধ্বনিকাব্যের বিষয়।

এই ধ্বনি আবার দু-প্রকারের (ক) সংলক্ষ্যক্রম, (খ) অসংলক্ষ্যক্রম।

সংলক্ষ্যক্রম বা লক্ষ্যক্রম ধ্বনি—বাচ্য অর্থের সম্পূর্ণ বোধ না হলে ব্যঙ্গ্য অর্থের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মায় না। বাচ্যার্থের বোধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রম বা পর্যায় অর্থাৎ আগে ও পরের ব্যাপার সব সময়েই থাকে। যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ উদ্ভবের ক্রমটি লক্ষ্য করা যায় বা স্পষ্ট বলে মনে হয় সেখানে সংলক্ষ্যক্রম বা লক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়।

অসংলক্ষ্যক্রম বা অলক্ষ্যক্রমধ্বনি—যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থে উদ্ভবের ক্রমটি লক্ষ্য করা যায় না, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একই কালে প্রকাশিত বলে মনে হয় সেখানে অসংলক্ষ্যক্রম বা অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়। একটি পদ্মফুলে সূচ বিঁধিয়ে দিলে পদ্মের পাঁপড়িগুলি পরপর ভেদ করে গেলেও খুব দ্রুততার কারণে ক্রমটি লক্ষ্যগোচর হয় না, অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিও ঠিক তেমনি। পেট্রোলে আগুন ছোঁয়ালে যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে কিংবা ব্লটিং পেপারে কালি ফেললে নিমেষের মধ্যে শুষে নিয়ে যেমন কাগজটি ভিজে ওঠে, তেমনি অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিতেও যেন মনে হয় ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে, কোনো পৌর্বাপর্য নেই।

সংলক্ষ্যক্রম এবং অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির আবার দুটি করে বিভাগ আছে। সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির বিভাগ দুটি হল বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার ধ্বনি। এবং অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির বিভাগ দুটি হল ভাবধ্বনি ও রসধ্বনি।

Scanned by CamScanner

বস্তুধ্বনি—যেখানে বাচ্যার্থ থেকে একটি বস্তু ব্যঞ্জিত হয় এবং তা বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিক মনোহারী হয়ে প্রধান হয়, সেখানে বস্তুধ্বনি হয়। বস্তুধ্বনি যেহেতু সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি তাই বাচ্যার্থ থেকে ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত বস্তুর ক্রমটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বস্তুধ্বনির উদাহরণ দু-রকমের হতে পারে— ১) বস্তু থেকে বস্তু ২) অলংকার থেকে বস্তু।

বস্তু থেকে বস্তু—

(১) "সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?
নব মালতীর কচিদলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।"

এই পংক্তিগুলির বাচ্যার্থ যা তাতে এমন কিছু মনোহারিত্ব নেই। একজন সুদূর আকাশের দিকে চেয়ে আছে এবং তার ঘটটি ঘাট ছেড়ে ভেসে যাচ্ছে। সে আনমনে নবমালতীর কচিদলগুলি দাঁত দিয়ে কাটছে। কিন্তু সমস্ত বাচ্যার্থ অতিক্রম করে এই পংক্তিগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে আর একটি কথা, সেটি হল নববর্ষার পটভূমিতে এক বিরহিনী বধূর ছবি। বধূ ঘট নিয়ে ঘাটে গেছে জল আনতে। বধূ আনমনা, সে ভাবছে প্রবাসী প্রিয়তমের কথা। এদিকে বাতাসের হিল্লোলে ঘট ভেসে যাচ্ছে। বিরহী বধূর আনমনা অবস্থা এবং প্রিয়তমের জন্যে ভাবনাই হল এই পংক্তিগুলির ব্যাঙ্গ্যার্থ এবং এটাই প্রধান ও অধিকতর মনোহারী। এখানে বর্ণনীয় বস্তু (বাচ্যার্থ) থেকে আর একটি বস্তু (ব্যঙ্গ্যার্থ) ধ্বনিত হয়েছে বলে এটি বস্তুধ্বনির উদাহরণ।

এবারে 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে রামচন্দ্রের একটি উক্তি নেওয়া যেতে পারে—

(২) "নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি! আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষস-গ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিত স্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে।
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে, কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে ভাই, আইনু আমরা।"

ষষ্ঠ সর্গ

Scanned by CamScanner

সপ্তম অধ্যায় | রসবাদ

যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা কাব্যপাঠ করি কেন? তাহলে এককথায় উত্তর আসবে আনন্দের জন্যে। কাব্য পাঠের ফলে আমাদের জাগতিক কোনো লাভ না হলেও আমরা রসানন্দ লাভ করি। এই 'রস' আসলে কি পদার্থ, কাব্যে তার গুরুত্ব কতটা, রসকে কাব্যের আত্মা বলা যায় কিনা, কিভাবে রসের অভিব্যক্তি ঘটে ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণে সংস্কৃত আলংকারিকগণ কালাতিপাত করেছেন। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পাঠক হিসাবে আমাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি। কারণ আমরা কাব্যের আত্মার সন্ধানে বেরিয়েছে। শব্দার্থ, অলঙ্কার, রীতি, গুণ, ধ্বনি ইত্যাদি একাধিক সিঁড়ি পার হয়ে আমরা সেই জগতের কাছাকাছি পৌঁছেছি, যে জগতে শুধুই আনন্দ বিরাজ করে। কাব্যপাঠকের এই আনন্দ অন্য কিছু নয়, রসের আনন্দ। রসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের দুরূহ-দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা সফল হবে। এই সাফল্যের ভাগীদার হতে আমরা রস-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করব।

প্রায় দু-হাজার বছর আগে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'রস' আসলে কি পদার্থ সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্ন তুলেই ভরত ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি নিজে তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, যা আস্বাদ্য তাই হ'ল রস। ভরত নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রসের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলেছিলেন, পরবর্তীকালে তা আর বিশেষ চর্চিত হয়নি, কিন্তু নবম শতকে ধ্বনিবাদিদের আলোচনায় রসের প্রসঙ্গটি পুনরায় গুরুত্ব পায়। এই শতকে আনন্দবর্ধন 'রসধ্বনি'কে কাব্যের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। দশম ও একাদশ শতকে অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের মূল কারিকার ও আনন্দবর্ধনকৃত বৃত্তির 'লোচনটীকা' লেখেন। তারপর থেকে পুনরায় রসের আলোচনায় জোয়ার দেখা দেয়। বিভিন্ন শতাব্দীতে আচার্য বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, কবিকর্ণপুর রসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

● রস কি?

সংস্কৃতে 'রস' ধাতুর অর্থ হ'ল আস্বাদন। এই 'রস'ধাতু থেকেই 'রস' শব্দটির উৎপত্তি। যাকে আস্বাদন করা যায় তাকে 'রস' বলে। মধুর, কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়, লবণ—এ সবগুলিই হল রস, কেননা এর সবগুলিই আমরা জিভ দিয়ে আস্বাদন করে থাকি। জিভ আস্বাদনের মাধ্যম বলে জিভের আর এক নাম রসনা। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 'Taste Organ'। সাহিত্যক্ষেত্রেও 'রস' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ একই। এখানেও 'আস্বাদন' অর্থে আমরা 'রস'কে গ্রহণ করে থাকি। তবে সাহিত্যে যে রস আস্বাদ্য, তা আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ সাহিত্যে বস্তুর নির্যাস পরিবেশিত হয় না, সাহিত্যিক নির্যাস পরিবেশিত হয়। তাই সাহিত্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি গুরুত্ব হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে রসনেন্দ্রিয় বা সহৃদয় পাঠকের অন্তরেন্দ্রিয়। একমাত্র সহৃদয় সামাজিকের অনুভূতিপ্রবণ মনই কাব্যরস আস্বাদনের অধিকারী। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন যে 'রসের আস্বাদ' কথাটির দ্বারা রস ও স্বাদের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানা হয় কিন্তু এ ভেদ নিতান্তই কাল্পনিক। কারণ

Scanned by CamScanner

যা আস্বাদ্য তাই হল রস। আমরা যেমন কথায় বলি 'ভাত পাক হচ্ছে' অথচ পাকের যা ফল তাই হ'ল ভাত। তেমনি যদিও আমরা বলি রসের প্রতীতি বা অনুভূতি, কিন্তু এই প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে রস। বহুকাব্য অধ্যবসায়ের ফলে যাঁদের মনোমুকুর স্বচ্ছ হয়েছে, সেই স্বচ্ছ মনোমুকুরে কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, তেমন দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই হ'ল 'রস'।

● ভাব ও রস

রসের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমরা দেখব কতকগুলি ভাব রসসৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু এই ভাব ও রস এক জিনিস নয়। ভাব জিনিসটা লৌকিক, আর রস জিনিসটা অলৌকিক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু কিছু ভাব থাকে এবং অনেক সময় সেই ভাবের প্রকাশও দেখা যায়। যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুতে অন্তরে শোকভাব জাগ্রত হলে আমরা কাঁদি, অর্থাৎ প্রিয়জনের মৃত্যুই হল শোকভাবের কারণ। কিন্তু লৌকিক জগতের এই 'শোক' রস নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন তখনই পাঠকের মনে অলৌকিক করুণরসের জাগরণ ঘটে। লৌকিক ভাবগুলি বিভিন্ন রকম হলেও অর্থাৎ শোকভাব, হাস্যভাব কিংবা রতিভাবের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এগুলি থেকে জাত করুণরস, হাস্যরস ও শৃঙ্গাররসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এই রসের সবগুলিই আনন্দের কারণ। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাই বলেছেন যে, রস হল একটি মানসিক অবস্থা এবং তা নিজের আনন্দময় সম্বিত বা চেতনার আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। ভাব ও রসের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু মনে না রাখলে কাব্যরসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

● "রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্বমাত্র"

কাব্যের সঙ্গে কাব্যতত্ত্বের আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই তফাৎটুকু বোঝা আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরি। জ্ঞানের জগৎ ও ভাবের জগতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে ইচ্ছা হয় না...কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না।' এর কারণটি লুকিয়ে আছে অলৌকিক জগতের আনন্দ আস্বাদের মধ্যে। সার্থক কাব্যের মধ্যে যে রসধ্বনি থাকে তাই সহৃদয়ে আনন্দের কারণ হয় কিন্তু তত্ত্বগ্রন্থ পাঠ করে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটলেও তা আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। রসতত্ত্ব বলতে যদি রসতত্ত্বের জ্ঞানকে বোঝায় তবে সে জগৎ একান্ত শুষ্ক, সেখান থেকে অলৌকিক কাব্যজগতের রস প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসাবে কেবল রসের জগতে মজে থাকলে চলে না, তত্ত্বের কাঠিন্যটুকু স্বীকার করে না নিলে শিক্ষাই যে অসম্পূর্ণ থাকে। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে দেহতত্ত্ব বা ডাক্তারির ছাত্রদের মনে রসের কোনো অস্তিত্বই নেই। যদি তা হত তাহলে পরশুরামের মত রসায়নবিদ্ কিংবা অভিজিৎ তরফদার ও বনফুলের মত ডাক্তার-সাহিত্যিক আমরা পেতাম না। তবু তাঁদের জীবিকার প্রয়োজনে হয়তো একদিন মানুষের শরীর নিয়ে কাটা ছেঁড়া করতে হয়েছিল। অভিজিৎ কিংবা বনফুল মানুষ নিয়ে সাহিত্য লিখে

Scanned by CamScanner

যে আনন্দ পান বা পেতেন সেই আনন্দ কি পেয়েছেন দেহের কঙ্কাল ঘেঁটে? সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনেই তাঁদের একদা দেহ-ব্যবচ্ছেদ করতে হয়েছিল। আর জ্ঞানের কথা একবার জানা হয়ে গেলে তার প্রতি আর মানুষের আগ্রহ থাকে না। সূর্য যে গোল, জল যে তরল এটা জানা হয়ে গেলে পুনর্বার এ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। অনুরূপভাবে যেদিন গাছ থেকে আপেলটা মাটিতে পড়েছিল সেদিন নিউটনের মনের মধ্যে তা বিস্ময়ের ভাব জাগিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেই বিস্ময়ের ভাবকে তিনি কাব্যের মাধ্যমে অলৌকিক আনন্দের বস্তু করে তুলতে চাননি, আপেলটির গাছ থেকে মাটিতে পড়ার সূত্রে তিনি প্রচার করলেন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব। এই তত্ত্বের বিষয়টি একেবারেই লৌকিক জগতের। তাই এ তত্ত্ব জেনে আমাদের জ্ঞান বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আনন্দিত হইনি। আজ মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আমাদের কাছে এতই পরিচিত যে ওটা নিয়ে আমরা আর বিশেষ আগ্রহী নই। অথচ কবে কোন বিস্মৃত দিবসে কালিদাস রচনা করেছিলেন মেঘদূত, সেই মেঘদূতের বিবর্ণ পাতা খুলে বসলে বিরহ জনিত আনন্দে পাঠকের মন আজও ভরে ওঠে। রসের জগতে আছে আনন্দ, কিন্তু রসতত্ত্বের জগতে আছে শুষ্কজ্ঞান। রসের আবেদন চিরন্তন কিন্তু রসতত্ত্বের আবেদন ক্ষণিক। চুইংগাম-এর ভুক্তাবশিষ্ট চর্বনের সঙ্গে রসগোল্লার রসাস্বাদনের যে তফাৎ রসতত্ত্বের সঙ্গে রসের তফাৎ ঠিক তেমনই।

● "কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ"

অধিকাংশ আলংকারিক কাব্যের জগৎকে অলৌকিক মায়ার জগৎ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন 'রস' জিনিসটা হ'ল অলৌকিক। অবশ্য এই অলৌকিক শব্দটির অর্থ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তাই 'রস' অলৌকিক বলতে ঠিক কি বোঝায় তা আমাদের কাছে অনেক সময়েই স্পষ্ট হয় না। কেউ কেউ অলৌকিক বলতে অতিপ্রাকৃত বা Super-naturalকে বুঝতে পারেন, কিন্তু কাব্য তো মানুষের জগতেরই বস্তু সুতরাং তা অলৌকিক হবে কেন? এর উত্তরে রসবাদীরা বলেছেন 'অলৌকিক' শব্দের অর্থ অতিপ্রাকৃত নয়, আবার তা লৌকিকও নয়। লৌকিক জীবনের উপলব্ধি থেকে এ হ'ল সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এটি হল এক ধরনের মানসিক অবস্থা। অধ্যাপক সুধীর কুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, "যাহা লৌকিক নয় তাহাই অলৌকিক। যে লৌকিক জগতে দুষ্যন্ত শকুন্তলা বিচরণ করিতেন তাহা বহুকাল গত হইয়াছে। এখন তাঁহারা কবি প্রতিভা বলে শব্দে সমর্পিত হইয়া বাক্য বপু লইয়া কাব্য জগতের অধিবাসী। কবি সৃষ্ট কাব্যজগৎ এক মায়ার জগৎ, অলৌকিক জগৎ। এই নিমিত্ত যাহা ছিল লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের কারণ বা কার্য তাহাই অলৌকিক কাব্য জগতে অলৌকিক বিভাব ও অলৌকিক অনুভাব হইয়া সামাজিক ও পাঠকের চিত্তে অলৌকিক রস সঞ্চার করিতেছে। এই অলৌকিকত্ব না থাকিলে তাহারা আমাদের চিত্তে রস নয়, কেবল ভাব জন্মাইত, যেমন জন্মাইত দুষ্যন্ত শকুন্তলা তাহাদের জীবিতকালের সখীদের মনে। চিত্তের ভাব প্রায় সকল সময়ে লৌকিক। তাহার আশ্রয়ে জাত রস সর্বদাই অলৌকিক এবং কাব্যজগতের বিভাবাদিও অলৌকিক।" এই কারণে অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বলেছিলেন, যে সমস্ত মনের ভাব রসে রূপান্তরিত হয় তারা অবশ্যই লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতের সঙ্গেই তাদের অস্তিত্ব এবং সেই জগতের সঙ্গেই তাদের কাজ কারবার।

Scanned by CamScanner

কিন্তু এই ভাব বা ইমোশনগুলি রস নয় এবং মানুষের মনে যে যে কারণে এই ভাবের জাগরণ ঘটে তাও কাব্য নয়। তাই লৌকিক জগতের কোনো মৃত্যু যদি কোনো নিকটাত্মীয়ের মনে শোকভাব জাগ্রত করে তবে সেই শোকভাবটি যেমন রস নয়, তেমনি সেই শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কিন্তু কবি যদি এই লৌকিক শোককে প্রতিভার মায়ায় কাব্যজগতে অলৌকিক করে তুলতে পারেন তবে তা সহৃদয়ের মনে করুণরসের উদ্রেক ঘটাবে। এই করুণরসকে শোকভাবের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে ভুল করা হবে। শোকভাবটি ছিল লৌকিক জগতের বিষয় কিন্তু শোকভাব যে করুণরসের জন্ম দিল তা আর লৌকিক জগতের বিষয় হয়ে থাকলো না, হয়ে উঠল অলৌকিক কাব্য জগতের বিষয়।

ভাবের নানারূপ আছে। এক একটি ঘটনায় আমাদের মনে এক একরকম ভাব জাগে। যেমন কেউ মারা গেলে জাগে শোকভাব, কারও অসংগত আচরণ দেখলে জাগে হাস্যভাব। কিন্তু এই উভয় ভাব থেকে জাত করুণরস ও হাস্যরস পাঠকের মনে কেবল আনন্দেরই জন্ম দেয়। আমরা স্বেচ্ছায় দুঃখের মুখোমুখি হতে কেউ চাই না। শোকভাব থেকে জাত করুণরসের কাব্য পাঠ করে আমাদের মন যদি দুঃখ ভারাক্রান্ত হত তবে সেই কাব্য থেকে আমরা শত হস্ত দূরে থাকতাম্। কিন্তু তা হয়না বলেই করুণরসের কাব্যপাঠে আমরা আগ্রহ দেখাই। ইংরেজ কবি বলেছিলেন, "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" কিন্তু মনে রাখা দরকার বাস্তবের কোনো ঘটনা যা সরাসরি আমাদের মনে 'sad thought' নিয়ে আসে তা আর যাই হোক sweet ও নয়, song ও নয়। কবি যখন কাব্যের মধ্যে 'saddest thought' এর কথা বলেন তখন তা 'sweetest song' হয়। ভাব ও রসের জগতের এই পার্থক্যটুকু স্মরণে রাখলে রস ও কাব্যের জগৎ কেন অলৌকিক মায়ার জগৎ এবং তা কেনই বা সহৃদয় পাঠকের আহ্লাদের কারণ সেটি বোঝা সহজ হয়। এখন প্রশ্ন এই মায়াজগৎ নির্মাণের কৌশলটি কেমন। এই সূত্রে স্মরণ করতে হয় আচার্য ভরতের অতি বিখ্যাত সূত্রটি।

• "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি":

ভরতের এই সূত্রটি ভালোভাবে বুঝতে হলে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব কাকে বলে এবং কিভাবে তার রসনিষ্পত্তি ঘটে বিস্তৃত আকারে তা জানা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে স্থায়ীভাবগুলিরও পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

• বিভাব

বিভাব শব্দের অর্থ হ'ল কারণ, অর্থাৎ রসানুভূতির কারণ। লৌকিক জগতের সবকিছুই আমরা বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি। কেউ মারা গেলে শোকভাবে আচ্ছন্ন হই, বিসদৃশ কিছু দেখলে হাস্যভাব জাগে, আবার ভূমিকম্পের মত ঘটনা ঘটলে মনের মধ্যে ভয়ভাব জাগে। এই ভাবগুলি সবই লৌকিক জগতের বিষয়। মনের মধ্যে এই ভাবগুলি জাগ্রত হওয়ার পিছনে বিশেষ কতকগুলি কারণ বা ঘটনা থাকে। যেমন কেউ মারা যাওয়া, বিসদৃশ কিছু দেখা কিংবা ভূমিকম্প হওয়া। ভাবগুলি যেমন লৌকিক জগতের বিষয় তেমনি ভাবের কারণগুলিও হল লৌকিক। কিন্তু এগুলিই যখন অলৌকিক কাব্যে বা নাটকে নিবেশিত হয়

Scanned by CamScanner

তখন তাদের বিভাব বলে। অর্থাৎ লৌকিক জগতে যা বিভিন্ন ভাবের উদ্‌বোধক কাব্যে বা নাটকে নিবেশিত হলে তাকেই বিভাব বলে। লৌকিক জগতের রাম, সীতা, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রত্যেকেই হলেন কারণ। এঁরাই যখন কবিদের হাতে পড়ে কাব্যের চরিত্র হয়ে উঠেছেন তখনই হয়ে গেছেন বিভাব। লৌকিক জগতের শকুন্তলার রূপ, গুণ, লাবণ্য, সৌন্দর্য ও যৌবন রাজা দুষ্মন্তের মনে রতিভাবের জাগরণ ঘটাতে পারে, আর এটাই যখন কাব্যে বর্ণিত হয় তখন হয়ে যায় বিভাব। এই বিভাব আবার দু রকমের 'আলম্বন বিভাব' ও 'উদ্দীপন বিভাব'।

আলম্বন বিভাব

আলম্বন শব্দের অর্থ হল বিষয় বা চিত্তবৃত্তির বিষয়। আমাদের চিত্তের যত কিছু বৃত্তি বা বিকার আছে তা কোনো না কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে উদ্ভূত হয়। প্রধানতঃ যে বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকেই আলম্বন বিভাব বলে। যেমন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে রতিভাব বা শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে তার আলম্বন বিভাব হলেন শকুন্তলা। অনুরূপভাবে শকুন্তলাও রাজা দুষ্মন্তকে দেখে তার প্রতি অনুরক্তা হন। তাই রাজা দুষ্মন্ত হলেন শকুন্তলার আলম্বন। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা ও কৃষ্ণ হলেন পরস্পরের আলম্বন, কারণ তাঁদেরকে অবলম্বন করেই মধুর রস পরিবেশিত হয়েছে।

এই আলম্বন বিভাবকে আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে আশ্রয় আলম্বন ও বিষয় আলম্বন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক পদেই যে রতি নামক স্থায়ীভাব আছে তার আশ্রয় হলেন শ্রীরাধিকা। তাই শ্রীরাধিকা হলেন আশ্রয় আলম্বন। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে রাধার মনে 'রতি' নামক স্থায়িভাব জাগ্রত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হলেন উক্ত স্থায়িভাবের বিষয় বা বিষয়ালম্বন।

উদ্দীপন বিভাব

যে সব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অলৌকিক ভাব বা রসের উদ্দীপনে সহায়তা করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। মনের মধ্যে কোনো ভাব উদ্দীপিত করতে গেলে তার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা আবশ্যক। পরিবেশের আনুকূল্য না পেলে ভাব উদ্দীপিত হতে পারে না। তাই দেখা যায় বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরাধিকার অন্তরে রতিভাবের উদ্বোধনে কালো কালিন্দীর জল, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠবর্ণ, কালো চুল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এগুলির সূত্রেই তাঁর কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। রধিকার অন্তরে এগুলি উদ্দীপনা জাগিয়েছে বলে এর সবগুলোই উদ্দীপন বিভাবের উদাহরণ। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার রূপসৌন্দর্য, বেশভূষা, মাল্যচন্দন প্রভৃতি রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব।

● অনুভাব

'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পশ্চাৎ-(অনু) ভাবিতা (ভাব)। অর্থাৎ ভাবের পশ্চাতে যা আসে বা প্রকাশ পায় তাকে অনুভাব বলে। ব্যবহারিক জগতে আমাদের হৃদয়ে যখন কোন ভাব জন্ম নেয় তখন বিভিন্ন শরীর চেষ্টার দ্বারা আমরা তা প্রকাশ করি। যেমন খুব রেগে গেলে আমাদের শরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে চোখ দিয়ে

Scanned by CamScanner

পড়ে। লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের এ জাতীয় আচরণগুলি যদি কাব্যে বর্ণিত হয় তবে তাকে অনুভাব বলে। মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যেসব স্বাভাবিক বিকার বা উপায়ে তা বাইরে প্রকাশিত হয়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য কাব্য বা নাটকের অনুভাব। ইংরেজিতে বলতে গেলে এগুলিকে Emotion এর Expression বলা যেতে পারে। Expression ছাড়া কোনো Emotion যেমন স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না তেমনি অনুভাব ছাড়াও ভাবের স্ফূর্তি ঘটে না। অন্তরের মধ্যে ভাবোদয়ের কারণ হল বিভাব, আর সেই কারণের কার্য হল অনুভাব। বিভাবের মত অনুভাবগুলিও হ'ল অলৌকিক।

- **স্থায়িভাব**

বাসনাশূন্য হয়ে মানুষ কখনো পৃথিবীতে জন্মলাভ করে না। মানুষের কিছু কিছু বাসনা বা প্রবৃত্তি হল সহজাত। যতদিন রক্তমাংসের মানুষ পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন তার বাসনা থাকবে। তাই দীর্ঘকালের অভিব্যক্তি বশে যে সমস্ত বাসনা মানুষের মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তা বৃদ্ধ থেকে শিশুতে, এক যুগ থেকে আর এক যুগে সঞ্চারিত হবেই। এই বাসনার কোনো শেষ নেই। মানুষের মনোজগৎ এরকম শত শত বাসনার দ্বারা প্রতি নিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে। এই বাসনা বা প্রবৃত্তিগুলিকে সাহিত্যমীমাংসকগণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—**স্থায়ী** ও **সঞ্চারী**। আমাদের চিত্তে অনন্ত ভাবরাজির মধ্যে যেগুলি সর্বদাই গূঢ়ভাবে বর্তমান রয়েছে সেগুলি হল স্থায়ীভাব। ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তি বা বাসনার মধ্যে এইভাবগুলি বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় বলেই এগুলি স্থায়ী। আলংকারিকগণ তাঁদের কাজের-সুবিধার জন্যে এরকম নয়টি ভাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এগুলি হল—রতি, হাস্, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। অভিনবগুপ্ত এই নয়টি ভাবকেই মাত্র স্থায়ী বলেছেন, কেননা প্রাণী জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই কয়টি বাসনার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এইসকল চিত্তবৃত্তি বিরহিত হয়ে কোনো প্রাণী জন্ম নিতে পারে না। তাই সকলেই জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয় ও সুখের জন্য লালায়িত হয়। ঈপ্সিত বস্তুর বিয়োগে মানবচিত্তের শোকাকুল স্বভাব কিংবা ভীষণ বস্তু দর্শনে ভয়াকুল হওয়া শিশু থেকে বৃদ্ধ সকল মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। আলংকারিকেরা যে নয়টি স্থায়ীভাবের কথা বলেছেন তাদের কখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা যায় না। তারা চিরন্তন, অক্ষয় ও অব্যয়। এদের উদয় এবং বিলয় কোনোটাই নেই। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই ভাবগুলিকে আস্বাদরূপ অঙ্কুরের মূল বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এগুলিরই একমাত্র রস-পরিণতি ঘটে। এরা আস্বাদরূপ অঙ্কুরের মূল বলেই স্থায়ী। স্থায়ীভাব থেকে যে সমস্ত রসের সৃষ্টি হয় সেগুলি হল যথাক্রমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

- **ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব**

'ব্যভিচারী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বি (বিশেষ) অভি (স্থায়ীর অভিমুখে) চর (চারণ করে) যারা। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব স্থায়ীভাবের অভিমুখে চারণ করে তাদের ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলে। ব্যভিচারী স্থায়ীভাবের মতই কিছু ভাব। কিন্তু স্থায়ীর সঙ্গে তার পার্থক্য হল তারা স্থায়ীর অভিমুখে বিচরণ করে। তারা স্থায়ীর মধ্যেই কখনো ডোবে, আবার কখনো

Scanned by CamScanner

ভেসে ওঠে। স্থায়ীর মত এই ভাবগুলি মনের মধ্যে বহুল রূপে প্রতীয়মান নয়, এ কখনই মনের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে থাকে না। মূল ভাবগুলির সূত্রে তারা মনের মধ্যে চলাফেরা করে মূল ভাবেরই পুষ্টি সাধন করে। স্থায়ীভাবের মধ্যেই এদের উদয় এবং বিলয় ঘটে। স্থায়ীভাবগুলি যেমন রসে রূপান্তরিত হতে পারে, ব্যভিচারী ভাবগুলি তেমন পারে না। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের কোনো রসরূপ নেই। আলংকারিগণ তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন,অপস্মার, গর্ব, মরণ, আলস্যতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা হর্ষ অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক। আলংকারিকগণ তেত্রিশটির মধ্যে ব্যভিচারীভাবকে সীমিত রাখলেও এই ভাবগুলির সংখ্যা কখনই তেত্রিশ হওয়া সমীচীন নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নানাভাবে নতুন ভাবের জন্ম নিচ্ছে, যা বহুযুগ আগে সংস্কৃত আলংকারিকগণ ভাবতে পারেননি। বর্তমানে এমন সমস্ত ভাব মানুষের মনে জন্ম নেয় যা স্বরূপত তেত্রিশটি ভাবের থেকে আলাদা। অধ্যাপক সুধীর কুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যালোক' গ্রন্থে আলংকারিকগণ প্রদত্ত তেত্রিশটি ব্যভিচারী ছাড়াও আরও তেত্রিশটি ব্যভিচারীর উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল করুণা বা দয়া, উপেক্ষা, ক্ষমা, শৌচ বা পবিত্রতা, প্রীতি, প্রমাদ, প্রসন্নতা, ঈর্ষা, দম্ভ, লোভ, নিন্দা, মান, অপমান, অভিমান, অনুতাপ, দম, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সন্তোষ, ভ্রান্তি, ছলনা, খলতা, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, কঠিনতা, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা, প্রগতি, বিদ্রূপ, বিদ্রোহ, সাম্য, সেবা ও সমুন্নতি। আচার্য ভরত আলংকারিকদের দ্বারা উল্লেখিত তেত্রিশটি ব্যভিচারীভাবকে 'রাজঅনুচর' বলেছিলেন এবং শারদাতনয় এগুলিকে সমুদ্রের 'তরঙ্গ' বলে উল্লেখ করেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র থেকে উঠে সমুদ্রের বুকেই বিলীন হয়, ব্যভিচারীভাবগুলিও তেমনি স্থায়ীভাব থেকে উদিত হয়ে স্থায়ীভাবের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঢেউবিহীন সমুদ্রের অস্তিত্ব যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি ব্যভিচারী বিহীন স্থায়ীভাবের রসত্ব অকল্পনীয়। ব্যভিচারী মূলভাবের রস-পরিপুষ্টির সহায়ক।

এ পর্যন্ত আমরা যে চারটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলির মধ্যে স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব হল মানসিক বা অন্তরঙ্গ উপাদান আর বিভাব ও অনুভাব হল বহিরঙ্গ উপাদান কারণ এই দুই উপাদান কাব্যজগৎ থেকে আসে। ভরত রসনিষ্পত্তির যে সূত্র দিয়েছেন তাতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সঙ্গে সংযোগের কথা বললেও এই সংযোগ কার সঙ্গে তার উল্লেখ করেননি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্থায়ীভাবের সঙ্গে এগুলির সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে। আচার্য বিশ্বনাথ তাই বলেছেন, সামাজিকদের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবে প্রকাশিত হয়ে রসরূপ লাভ করে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী সংযোগে রসনিষ্পত্তির বিষয়টি বেশ জটিল। স্বয়ং ভরত এর উল্লেখ করলেও উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে আচার্য ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক ও ভট্টনায়ক রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁদের উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ ও ভুক্তিবাদেও রসনিষ্পত্তির রহস্যটি যথার্থভাবে ধরা পড়েনি। এ ব্যাপারে সকলকে পিছনে ফেলে যুক্তিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছিলেন অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিব্যক্তিবাদে। তাঁর ব্যাখ্যা থেকে রসনিষ্পত্তির প্রসঙ্গটি

Scanned by CamScanner

আমাদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করার আগে ভরত নিজে রসনিষ্পত্তি বিষয়ে কি বলেছেন তা জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

● রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে আচার্য ভরত

আচার্য ভরত যদিও নাট্যরস প্রসঙ্গে 'রসনিষ্পত্তি'র সূত্রটি ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায় কাব্য সম্পর্কেও তিনি অনবহিত ছিলেন না। রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভরত বলেছেন, "যেমন নানা রকম ব্যঞ্জন, ওষধি এবং দ্রব্যের সংযোগে ভোজ্য (রস) নিষ্পন্ন হয়, যেমন গুড় প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ওষধির সাহায্যে ষাড়বাদি' রস তৈরী হয়,"। ঠিক তেমনই নানাভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। ভরতের ব্যাখ্যানুযায়ী 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'নিষ্পন্ন' কিংবা 'তৈরি' কিংবা 'স্বরূপত্ব লাভ।'

'সংযোগ' শব্দের অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে ভরত বলেছেন, "নানা ব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন ভোজনকারী জনগণ যেমন রসাস্বাদন করে আনন্দ লাভ করেন, তেমনি বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়িভাবের আস্বাদন গ্রহণ করে সহৃদয় দর্শক আনন্দ প্রভৃতি লাভ করেন।" ভরত যেহেতু লৌকিক জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে 'সংযোগ' বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন আমরাও তাই সেই লৌকিক জীবনের দৃষ্টান্তটিকে আর একটু সহজ করে ব্যাখ্যা করতে চাই। ধরা যাক আমাদের বাড়িতে কোনো অতিথি আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তাঁকে মধ্যাহ্নভোজে আহ্বান করে কেবলমাত্র অন্ন দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারি না। তিনি খেয়ে যাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন তার জন্যে আমরা পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজন করি। তাতে মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, তরি-তরকারি সবই থাকে। এগুলি সহযোগে তিনি যদি ভাত খান তবে তা তাঁর তৃপ্তির কারণ হয়। তখন ভাত খেয়ে তিনি আনন্দ পান। অনুরূপভাবে নাটক দেখতে গিয়ে সহৃদয় দর্শকের যে স্থায়িভাবের আস্বাদন হয় তা অন্যনিরপেক্ষ নয়। বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত স্থায়িভাবের (ঠিক যেন পঞ্চব্যঞ্জন যুক্ত অন্ন) আস্বাদন গ্রহণ করেই সহৃদয় দর্শক আনন্দিত হন। ভরতের ব্যাখ্যানুযায়ী নাট্যরস হল ভোজ্যরস, স্থায়িভাব হল অন্ন এবং বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী হল ব্যঞ্জন। সুতরাং বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সঙ্গে স্থায়িভাবের সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপিত হলে 'রস-সিদ্ধি' ঘটে। এই 'সিদ্ধি' শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি বা নির্মিতি। 'নির্মিতি' বলতে ভরত 'নিষ্পত্তি'কে বুঝেছিলেন। সুতরাং 'রসনিষ্পত্তি' বলতে বোঝায় রসের উৎপত্তি বা নির্মিতি।

● অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

ভরত 'রসনিষ্পত্তি'র সূত্রটি ব্যাখ্যা করলেও যাঁর হাতে এই সূত্রের চরম স্ফূর্তি ঘটেছিল তিনি হলেন টীকাকার অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত কেবল অভিব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিতই করেননি, তাঁর পূর্ববর্তী টীকাকারদের মতবাদকে যুক্তিসহ খণ্ডনও করেছিলেন। 'ধ্বন্যালোক' এর 'লোচন-টীকা'য় তিনি কাব্যের রসাভিব্যক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল : "শব্দসমর্প্যমাণ হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাব-সমুদিত-প্রাঙনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ" এই সংজ্ঞাটিতে রসের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে। এর

Scanned by CamScanner